Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা শ্রাবণী

রোলঃ 228021139

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা শ্রাবণী

রোলঃ 228021139

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন সুলতানা শ্রাবণী, আইডিঃ 228021139 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sharmin Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শারমিন সুলতানা শ্রাবণী

আইডিঃ 228021139

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা 5

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট 5

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য 5

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি 6

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা 6

অধ্যায় ২: ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান 7

২.১ আরবীয় জাহেলি সমাজে নারীর অবস্থান 7

২.২ প্রাচীন সভ্যতাসমূহে নারীর অবস্থান 8

২.৩ অন্যান্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী 10

অধ্যায় -৩ . পবিত্র কোরআনে নারীর মর্যাদা ও অধিকার 12

৩.১: আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও ধর্মীয় সমতা 12

৩ .২ সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী-পুরুষের অবস্থান 16

৩.৩: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার 18

৩.৪ পারিবারিক জীবনে নারীর অবস্থান 22

অধ্যায় ৪. হাদীসে নারীর সম্মান ও অধিকার 26

৪.১ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবনে নারীদের প্রতি আচরণ 26

৪.২: নারী শিক্ষা সম্পর্কিত হাদীস- 28

৪.৩ – পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত হাদিস 29

৪.৪ – সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে হাদিস 31

অধ্যায় ৫: ইসলামী আইনে (ফিকহে হানাফি) নারীর অধিকার 33

৫.১ বিবাহ সম্পর্কিত আইন: 33

৫.২ তালাক ও অন্যান্য বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া 38

৫.৩ সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকার 42

৫.৪ সাক্ষ্য ও বিচার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান 44
অধ্যায় ৬ : ইসলামি ইতিহাসে নারীর অবদান ও অর্জন.. 50
৬.১ নবীর যুগে বিশিষ্ট নারী সাহাবীগণ 50
খাদিজা (রা.) এর জীবন ও অবদান.. 50
৬.২ খিলাফতের যুগে নারীর অবস্থান.. 54
অধ্যায় ৭: সমসাময়িক বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জ.. 59
৭.১ বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিতর্ক 59
৭.২: হিজাব ও পর্দা সম্পর্কিত আলোচনা... 62
৭.৩: নারী নেতৃত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি 64
৭.৪ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ.. 66
৭.৫: নারী নির্যাতন ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ 69
অধ্যায় ৮. প্রস্তাবিত নারী সংস্কার কমিশন' ও এর স্বরূপ 71
৮.১ -পারিবারিক ,সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে.. 71
৮.২-ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ.. 73
অধ্যায় ৯: নারীর অধিকার নিয়ে ভুল ধারণা ও বাস্তবতা 76
৯.১ প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ 76
৯..২: ভুল ধারণার উৎস ও কারণ.. 78
৯..৩ সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা 79
অধ্যায় ১০: উপসংহার 81
১০.১: সার-সংক্ষেপ 81
১০.২: সামগ্রিক সিদ্ধান্ত... 81
১০.৩: কার্যকরী সুপারিশ ও প্রস্তাবনা... 83

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম এবং নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিতর্ক একটি জ্বলন্ত বিষয়। একদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ও বিশ্লেষকদের একাংশ ইসলামকে নারী বিরোধী ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা রয়েছে, অন্যদিকে সনাতনপন্থী মুসলিম বিশ্লেষকগণ প্রায়শই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও সাংস্কৃতিক প্রথাকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। এই দ্বিমুখী বিভ্রান্তির মাঝে সত্যিকারের ইসলামিক দৃষ্টিকোণ অনেক সময়ই হারিয়ে যায়।

বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও নারীর অধিকার নিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। ইসলামিক শরীয়াহ'র সঠিক ব্যাখ্যা এবং প্রাদেশিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন অপরিহার্য।

বর্তমান গবেষণা এমন একটি সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে যখন সারা বিশ্বে নারী অধিকার আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হচ্ছেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন। এই প্রেক্ষাপটে, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ, সুসংহত ও প্রামাণিক গবেষণা সমকালীন সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ**: ইসলামের মূল দুটি উৎস থেকে নারী সম্পর্কিত শিক্ষা, নির্দেশনা এবং আদর্শ সমূহের গভীর অনুসন্ধান।

২. **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন**: ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর তার মর্যাদার পরিবর্তন পর্যালোচনা।

৩. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ**: অন্যান্য ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনি ব্যবস্থার সাথে ইসলামিক বিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

৪. **ইসলামী ইতিহাসে নারীর অবদান উন্মোচন**: বিভিন্ন কালে বিশিষ্ট মুসলিম নারীদের অবদান ও তাদের জীবন থেকে শিক্ষণীয় দিকসমূহ তুলে ধরা।

৫. **সমসাময়িক বিতর্ক ও ভুল ধারণা নিরসন**: ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা চিহ্নিত করে সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান।

৬. **ইসলামিক ফেমিনিজমের দার্শনিক ভিত্তি অনুসন্ধান**: একটি সমন্বিত দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে আধুনিক নারীবাদী চিন্তাধারা ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ স্থাপন।

৭. **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ:** দেশীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগের সম্ভাবনা নিরূপণ।

৮. **ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রদান:** গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীদের জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

ক. প্রাথমিক উৎস বিশ্লেষণ:

- পবিত্র কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ
- সহীহ হাদিস সংকলন (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) থেকে নারী সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- প্রাচীন ফিকাহ গ্রন্থ ও ইসলামিক আইন সংকলন অধ্যয়ন

খ. দ্বিতীয়ক উৎস পর্যালোচনা:

- সমসাময়িক ইসলামিক বিদ্বানদের গবেষণা ও প্রবন্ধ
- ইসলামিক স্কলার, নারীবাদী চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের লেখা বই ও প্রবন্ধসমূহ
- বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র ও জার্নালসমূহ

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যেকোনো গবেষণার মতোই এই গবেষণারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. **ভাষাগত সীমাবদ্ধতা:** আরবি ভাষায় মূল উৎসগুলো থেকে সরাসরি অনুবাদের প্রক্রিয়ায় কিছু অর্থগত পরিবর্তন হতে পারে।

২. **সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা:** সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

৩. **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** ধর্মীয় ব্যাখ্যার সাথে সাংস্কৃতিক প্রথার মিশ্রণ বিশ্লেষণকে জটিল করে তোলে।

৪. **গবেষকের পূর্বধারণা:** সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও গবেষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. **বিদ্যমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা:** এই বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণার অপ্রতুলতা এবং বাংলা ভাষায় একাডেমিক গবেষণার স্বল্পতা। বিদ্যমান গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু গবেষণা হলেও, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, একাডেমিক গবেষণার সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণাগুলো সমন্বিত পদ্ধতি অর্থাৎ কুরআন, হাদিসের আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর

বাস্তবিক প্রয়োগ কিভাবে করা যায় সেই আংগিকে করা হয় নি । ফলে একটি সমন্বিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রামাণিক গবেষণার অভাব রয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রামাণিক উৎস, সমন্বিত গবেষণা পদ্ধতি এবং দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে ইসলামে নারীর প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যদিও উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় রেখে এই গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করা উচিত।

অধ্যায় ২: ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান

২.১ আরবীয় জাহেলি সমাজে নারীর অবস্থান

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপে জাহেলি যুগ (অজ্ঞতার যুগ) নামে পরিচিত একটি সময়কাল ছিল। এই সময়ে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মান্তিক। জাহেলি যুগে আরবীয় সমাজে নারীদের বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ ছিল:

সামাজিক মর্যাদা: জাহেলি যুগে নারীদের কোনো স্বাধীন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা পিতা, স্বামী বা পুত্রের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। কন্যা সন্তান জন্মের পর অনেক পিতাই লজ্জাবোধ করতেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার গ্লানি থেকে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে লোকদের থেকে। সে চিন্তা করে, অপমান সহ্য করে এটি রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!" (সূরা নাহল, ১৬:৫৮-৫৯)

অর্থনৈতিক অধিকার: জাহেলি সমাজে নারীদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। তারা পিতার বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। এমনকি তাদের নিজস্ব অর্জন বা সম্পদও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত না।

বিবাহ ব্যবস্থা: জাহেলি যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের কোনো পছন্দ বা মতামতের অধিকার ছিল না। বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, যেমন:

১. **বাল্য বিবাহ:** পুরুষ একজন নারীকে তার অভিভাবকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বিবাহ করত।

২. **ইস্তিবদা বিবাহ:** পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য উচ্চবংশীয় পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করত, উদ্দেশ্য ছিল সন্তান লাভ করা।

৩. **মুত'আ বিবাহ:** অস্থায়ী বিবাহ, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নারীকে 'ভাড়া' করা হতো।

৪. **শিগার বিবাহ:** দুই পুরুষ পরস্পর নিজেদের কন্যা বা বোনকে বিনিময় করত, এতে কোনো মোহরানা প্রদান করা হতো না।

বহুবিবাহ: কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অসংখ্য বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

তালাক: পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, নারীর কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা তত বার তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে পারত।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার: নারীরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকেও উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যাকে স্বামীর পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্য 'উত্তরাধিকার' হিসেবে বিবাহ করতে পারত।

শিক্ষা: নারীদের শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না, তাদের মূল্যায়ন করা হতো শারীরিক সৌন্দর্য এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়ে।

যুদ্ধবন্দী: যুদ্ধে বন্দী নারীদের ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং তাদের সাথে যৌন নিপীড়ন অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা ছিল।

জাহেলি সমাজে নারীদের এই অবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবীয় সমাজে নারীরা কতটা অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবির্ভাব নারীদের জন্য এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

২.২ প্রাচীন সভ্যতাসমূহে নারীর অবস্থান

ইসলাম পূর্ব যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নারীদের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বত্রই নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো। নিম্নে কয়েকটি প্রধান সভ্যতায় নারীদের অবস্থান সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

মিশরীয় সভ্যতা:

- প্রাচীন মিশরে অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় নারীদের অবস্থান কিছুটা ভালো ছিল।
- উচ্চবংশীয় নারীরা সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার এবং আইনি চুক্তি করার অধিকার ভোগ করতেন।
- কিছু ক্ষেত্রে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভোগ করতেন, যেমন ক্লিওপেট্রা, হাতশেপসুত প্রমুখ।
- তবে সাধারণ নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, বিশেষ করে ক্রীতদাস নারীরা।

গ্রিক সভ্যতা:

- প্রাচীন গ্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল না এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রিক দার্শনিক ও

চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

- তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এ ছাড়া নারীর যদি অন্য কোনো কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে।
- 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্ত ািবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেন: "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।" এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে; কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয়; বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনের জন্যেই।

রোমান সভ্যতা:

- রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সেই।
- সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই আয়ত্বাধীন ছিল। রোমান সমাজেও নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোনো রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত।
- অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মে নেওয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো।
- রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেওয়ার অধিকার ছিল না।
- রোমান সমাজে অন্য এক ধরনের বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে 'সর্দারি বিয়ে' বলা হতো। এর মাধ্যমে যেকোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারি বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা হলে তাকে

সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও রাখতো, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।

- এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্রসন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দু ধর্মে নারী

- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দানকারিণী রূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামির জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। (বিশ্ব ইতিহাস-৩৯৪, বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজে আজও নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্মমতে নারীর কোনো অধিকার বা মর্যাদা নেই।)
- মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্য দুঃখজনক হয়, তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাশই হোক না কেন। কেননা, কেবল ওই জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটিমাত্র কথা বলবে।
- নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না; বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে। "

২.৩ অন্যান্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নারী

ইহুদি ধর্মে নারী

ইহুদিরা যদিও এক আসমানি দ্বীনেরই অনুসারী ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যেও একদল বোনকে তার ভাইয়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ইহুদি সমাজে নারীর মান ছিল নিছক সেবিকার সমান। ইহুদি নারীদের তাদের ভাইদের মতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অংশ দেওয়া হতো না এবং ইহুদি পিতা তার প্রাপ্ত কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকারও রাখতো।

খ্রিষ্ট ধর্মে নারী

খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তো দু'দুবার নারীদের মান খর্বকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে। অথচ এই খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে দয়া ও স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবি করতো। এরাই নারীদের ব্যাপারে তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' থেকে এই বক্তব্যের উল্লেখসহ প্রচার করে যে- "নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এই নারী।" নারীদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ধারণাও ঠিক হিন্দুদের মনুর মতো ছিল যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা এবং পাপের প্রতিমা।" কোনো কোনো খ্রিস্টান পণ্ডিত তো আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।" তারা আরো বলেছে- "নারীদের ওপর অভিসম্পাৎ করা অপরিহার্য, কেননা বিপথগামিতার আসল কারণ এটাই।" খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আর এক গোষ্ঠীর ধারণা হচ্ছে- "নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ। শয়তান নারীর বেশ ধরে দৃশ্যমান হয়।" এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ছিল খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রিদের। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যে, "নারী কি পুরুষের মতো খোদার উপাসনা করতে পারে?" "নারী কি স্বর্গে যেতে পারবে? নারীর মধ্যে কি মানবিক আত্মা আছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবনযাপন করে?" বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন ও একদেশদর্শিতামূলক। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরূপ ও মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন। এভাবে তিনি নারীত্ব ও গৃহধর্মের আদর্শকে অবহেলিত ও অবমাননা করেন। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতেন। তাদের সমাজে নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। হিন্দু সমাজের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও মেয়ের জন্ম অলুক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হত। মেয়েরা এত স্বল্প মূল্যের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত যে, তাদের কোন ভাল নামও রাখা হত না। ক্ষুদ্র পা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে তখনকার বৌদ্ধ সমাজের প্রবাদ ছিল। এ কারণে তারা মেয়েদের পা শৈশব থেকে বেঁধে রাখত। এর ফলে মেয়েরা ক্ষুদ্র ও কদাকার হতে বাধ্য হত। তারা সব সময় পুরুষের তাঁবেদার হয়ে থাকত। জাপানেও সে সময় কন্যাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করা হত। পিতা কন্যাকে সাময়িকভাবে বেশ্যালয়ে বিক্রয় করতে বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারতেন। তারা পূজা-অর্চনায় যোগদান বা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতে পারত না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধরা নারী মর্যাদায় আগ্রহী ছিল না। বরং কিভাবে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা যায় সে ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। রায় দীনেশ চন্দ্র বাহাদুরসহ অনেকেই বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবনতির আরো ভয়াবহ চিত্র অংকিত করে গেছেন।

অধ্যায় -৩ . পবিত্র কোরআনে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

৩.১: আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও ধর্মীয় সমতা

- **১. ধর্মীয় কর্তব্য ও আচরণের সমান দায়িত্ব**

আয়াত:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ... أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(৩৩:৩৫) — সূরা আহযাব —

বাংলা অনুবাদ:

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বিনয়ী, দানশীল, রোজাদার, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী — আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"

ব্যাখ্যা:

- এই আয়াতটি ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ধর্মীয় দায়িত্ব ও প্রতিদানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

- এখানে প্রত্যেকটি গুণ (যেমন: মুসলিম, মুমিন, ক্বানিত, সাদিক, সাবির ইত্যাদি) উভয় লিঙ্গের জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- এটি প্রমাণ করে যে নারী কেবল গৃহস্থালির দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও পুরুষের সমান।

- আল্লাহ নারীদেরও 'মাগফিরাহ' ও 'আযিম আজর' (মহাপুরস্কার) প্রদান করবেন বলে উল্লেখ করেছেন।

- এটি কেবল সমাজের স্বীকৃতি নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদার ঘোষণা।

- তাফসীর ইবন কাসীরে বলা হয়েছে: "আল্লাহ নারীদের ধর্মীয় মর্যাদা হ্রাস করেননি, বরং দ্বিগুণ ভাবে মর্যাদা দান করেছেন।" (ইবনে কাসীর, সূরা আহযাব ৩৩:৩৫ ব্যাখ্যা)

- মা'আরিফুল কুরআন ব্যাখ্যায় বলা হয়: "এই আয়াত একটি ঘোষণাপত্র যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী।" (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৫)

- নবীজী (সাঃ) নিজেও উক্ত আয়াত পাঠ করে সাহাবিদের নারীকে হেয় না করতে নির্দেশ দিতেন।

- ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্মব্যবস্থায় নারীর ধর্মীয় দায়িত্ব সীমিত ছিল, কেবল ইসলাম তা পূর্ণাঙ্গরূপে সমতা দেয়।

- এ আয়াত মুসলিম সমাজে নারীর আধ্যাত্মিক সম্মানের ভিত্তি গড়ে তোলে।

○ **২. ঈমান ও আমলে সমতা**

আয়াত:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِن(১৬:৯৭) সূরা নাহল — ...ٌ

বাংলা অনুবাদ:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন হয় — আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং উত্তম প্রতিদান প্রদান করব।"

ব্যাখ্যা:

- এই আয়াতটি নারী-পুরুষের আমল ও ঈমানের ভিত্তিতে সমান প্রতিদান নিশ্চিত করে।
- এটি স্পষ্ট করে বলে, "مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ" — যার মাধ্যমে আল্লাহ্ সরাসরি লিঙ্গসমতা ঘোষণা করেন।

- সৎকর্মের মূল্যায়নে ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

- "حَيَوٰةً طَيِّبَةً" — পবিত্র ও শান্ত জীবন শুধু পুরুষ নয়, নারীকেও দেয়া হবে।

- পরকালীন পুরস্কারের ক্ষেত্রেও সমান মর্যাদা রয়েছে।

- মা'আরিফুল কুরআনের ভাষ্য মতে: "এই আয়াত নারীর স্বতন্ত্র পরিচয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক বিস্ময়কর দলিল।" (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫৬)

- ইবনে কাসীর বলেন: "মুমিন নারী যদি সৎকাজে অগ্রগামী হয়, তবে পুরুষের চেয়েও বড় মর্যাদা লাভ করতে পারে।" (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নাহল ১৬:৯৭)

- এই আয়াত সমাজে নারীর কর্মক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতাকে শক্ত ভিত্তি দেয়।

- নারীকে যদি সঠিক সুযোগ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়, তবে সে ধর্মীয় দিক দিয়ে উচ্চতর হতে পারে।

- এই আয়াত নারী শিক্ষার গুরুত্বকেও বৈধতা দেয়, কারণ আমলের জন্য জ্ঞান অপরিহার্য।

◇ ৩. কর্মফল ও পরকালীন প্রতিদানে সমতা

আয়াত:

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ... — সূরা নিসা (৪:১২৪)

বাংলা অনুবাদ:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, এবং সে মুমিন হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"

ব্যাখ্যা:

- ইসলামে পরকালের প্রতিদান নির্ধারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই — এই আয়াত তারই প্রমাণ।

- "لا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا" — কোনোরকম অবিচার হবে না, লিঙ্গভিত্তিক নয় বরং আমলভিত্তিক।

- জান্নাতের প্রতিশ্রুতি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই রয়েছে।

- এই আয়াত সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা নারীদের ধর্মীয় অগ্রগতিকে হেয় করে।

- ইবনে কাসীর বলেন, "নারীরা জান্নাতে প্রবেশের সমঅধিকার রাখে; এটি ঈমান ও সৎকর্মের ভিত্তিতে প্রমাণিত।" (সূরা নিসা তাফসীর, আয়াত ১২৪)

- মা’আরিফুল কুরআন জানায়: “নারীকে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কখনো ন্যূনতা করা হবে না।” (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

- যারা নারীর ধর্মীয় মর্যাদা খাটো করে দেখে, এই আয়াত তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।

- এই আয়াত ইসলামপূর্ব যুগের নারী বিদ্বেষী সংস্কৃতির জবাব।

- সৎকর্মে নারী এগিয়ে গেলে সে পুরুষকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে — ইসলাম এটিকে স্বীকৃতি দেয়।

- এটি মুসলিম নারীর আখিরাত কেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাসকে মজবুত করে।

◇ ৪. তাকওয়া ও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারণ

আয়াত:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ — সূরা হুজুরাত (৪৯:১৩)

বাংলা অনুবাদ:

“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার।”

ব্যাখ্যা:

- এই আয়াতে লিঙ্গ, জাতি, বংশ, গোষ্ঠী নয় — বরং তাকওয়াকেই মর্যাদার মানদণ্ড করা হয়েছে।

- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এটি এক অভিন্ন মর্যাদা নির্ধারণের সংবিধান।

- ইসলামে নারীর সম্মান পুরুষের নির্ভরশীল নয় বরং তার ব্যক্তিগত তাকওয়া ও আমলের উপর নির্ভর করে।

- তাফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে: “আল্লাহর কাছে কেউ বংশগৌরবে নয় বরং তাকওয়ায় এগিয়ে থাকলেই মর্যাদাশীল” (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২১)।

- মা‘আরিফুল কুরআন বলে: “এই আয়াত মানব মর্যাদার সবচেয়ে বড় সংজ্ঞা দেয়।” (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০১)

- এর মাধ্যমে নারীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে ধর্মীয় উন্নতিতে এগোতে পারে।

- ইসলামী দৃষ্টিতে একটি অশিক্ষিত কিন্তু পরহেযগার নারী, একজন বিদ্বান কিন্তু অহঙ্কারী পুরুষের চেয়েও মর্যাদাবান।

- কোনো পুরুষ যদি তাকওয়ার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে, তবে নারী তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

- এই আয়াত নারীর আত্মমর্যাদা চেতনার ভিত্তি রচনা করে।

- সমাজে নারীকে হেয় করার যে ধারণা আছে — এই আয়াত তার খণ্ডন করে, তাকওয়াকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

৩ .২ সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী-পুরুষের অবস্থান

(ক) আদম ও হাওয়া (আ.) সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ

১."يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء**"...**ً

অনুবাদ: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গীনি (হাওয়া) সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন..."**(সূরা নিসা ৪:১)**

তাফসীর:

- "نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" (এক نفس) দ্বারা আদম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে, আর "زَوْجَهَا" (সঙ্গীনি) দ্বারা হাওয়া (আ.)-কে, যা নারী-পুরুষের সমমূল্য উৎস নির্দেশ করে।**(ইবনে কাসীর (তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/২৫৬)**
- হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এটি নারীর অধস্তনতা নয়; বরং উভয়ই মানবতার সমান অংশীদার।**(তাবারী (জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৪/২৫১)**

২. "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا**"...**

অনুবাদ: "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়..."***(সূরা আ'রাফ ৭:১৮৯)***

তাফসীর:

- নারী-পুরুষের সম্পর্কের মূল লক্ষ্য পারস্পরিক শান্তি ও সম্পূরকতা ("لِيَسْكُنُ"), যা শ্রেষ্ঠত্ব বা অধীনতার ধারণাকে খণ্ডন করে।**(কুরতুবী (আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ৭/৩০২)**
- এই আয়াত বিবাহকে একটি আত্মিক ও শারীরিক ভারসাম্য হিসেবে উপস্থাপন করে।**(আল-সা'দী (তাইসির আল-কারিম, পৃষ্ঠা ৩২০)**

(খ) 'জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি' ধারণা

১."وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون**"**

অনুবাদ: "আমি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"**(সূরা যারিয়াত ৫১:৪৯)**

তাফসীর:

- এই আয়াত কেবল নারী-পুরুষ নয়, বরং প্রকৃতির সকল স্তরে জোড়ার অস্তিত্বকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে।**(মুফতি শফী (মাআরিফুল কুরআন, ৮/২৯৪)**
- "زَوْجَيْنِ" (জোড়া) শব্দটি সমতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণা বহন করে।**(আশ-শাওকানী (ফাতহুল কাদীর, ৫/১৩৭)**

২. "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً**..."(সূরা নাহল ১৬:৭২)**

অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই প্রজাতির মধ্যে থেকে সঙ্গীনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন..."

তাফসীর:

- "مِنْ أَنفُسِكُم" (তোমাদেরই প্রজাতি থেকে) বলতে নারী-পুরুষের একই সত্তা থেকে সৃষ্টি হওয়ার কথা স্পষ্ট করে।**(ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (তাফসীরে তাবারী, ১৪/১৪৩)**

(গ) একই আত্মা থেকে সৃষ্টি

২.هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا ۚ **(সূরা আ'রাফ ৭:১৮৯)**

অনুবাদ: তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে।

তাফসীর:

- হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.)-এর পাঁজর থেকে সৃষ্টির বর্ণনা (সহীহ বুখারী ৩৩২৬) নারীর অধস্তনতা নয়, বরং তাদের আত্মিক সমতা ও শারীরিক নৈকট্যকে নির্দেশ করে।**(ইবনে কাসীর (৩/৪৮৭)**

- এই সৃষ্টি পদ্ধতি নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক আকর্ষণ ও সহমর্মিতার ভিত্তি স্থাপন করে।(**আল-আলুসী (রুহুল মাআনী, ৯/৮৯**)

(ঘ) একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ও প্রশান্তি

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً**..."(সূরা রূম ৩০:২১)**

অনুবাদ: "তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই প্রজাতির মধ্যে থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন..."

তাফসীর:

- "سَكَنٌ" (শান্তি) এবং "مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (ভালোবাসা ও দয়া) নারী-পুরুষের সম্পর্কের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে, যা সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে অকার্যকর করে।**সাইয়েদ কুতুব (ফী যিলালিল কুরআন, ৫/২৭৮৯)**
- এই আয়াত বিবাহকে একটি নৈতিক ও সামাজিক চুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যেখানে উভয় পক্ষের অধিকার সম্মানিত।**আত-তাহের ইবনে আশুর (তাফসীর আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর, ২১/৩০)**

৩.৩: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার

১. শিক্ষার অধিকার-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ — সূরা যুমার (৩৯:৯)

বাংলা অনুবাদ:

"বলুন, যারা জ্ঞান রাখে এবং যারা জ্ঞান রাখে না—তারা কি সমান হতে পারে?"

বিশ্লেষণ :

- যদিও এই আয়াতে নারী-পুরুষের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই, কিন্তু এটি সকল মানুষের (নারী ও পুরুষ) জন্য শিক্ষা গ্রহণের মর্যাদা তুলে ধরে।

- জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য ইসলাম যে কতটা গুরুত্ব দেয়, তা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে।

- কুরআন এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে শিক্ষা গ্রহণ কেবল পুরুষদের জন্য নির্ধারিত।

- "يَعْلَمُونَ" (জ্ঞান রাখে) — এই শব্দটি সাধারণ, এটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ।

- মা'আরিফুল কুরআনে (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫৭৮) বলা হয়েছে: এই আয়াতের প্রেক্ষিতে নারীর শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- নারীদের জ্ঞান অর্জনের অধিকার অস্বীকার করলে, এই আয়াতের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

- ইসলামে জ্ঞান অর্জন একটি সম্মানজনক ইবাদত, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য।

- জ্ঞানের অভাবে নারী সমাজ অধিকারবঞ্চিত হয়ে পড়ে—এই আয়াত তার প্রতিবাদ হিসেবে উপস্থাপিত।

- এই আয়াত নারীকে আত্মজাগরণের পথে আহ্বান করে—নিজেকে যোগ্য, সচেতন ও আলোকিত করার আহ্বান।

- আধুনিক সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যতটা, ইসলামের মূল উৎস কুরআন তা বহু পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছে।

২. সম্পত্তির অধিকার

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(৪:৭) — সূরা নিসা

বাংলা অনুবাদ:

"পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়রা যা রেখে যায় তা থেকে একটি অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও একটি নির্ধারিত অংশ রয়েছে—সে তা কম হোক বা বেশি—এটি নির্ধারিত অংশ।"

বিশ্লেষণ:

- এই আয়াত সম্পূর্ণরূপে নারীর অর্থনৈতিক ও সম্পত্তিগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

- এখানে পুরুষ ও নারীর উভয়ের জন্য "نَصِيبٌ" বা নির্ধারিত অংশের কথা বলা হয়েছে।

- ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের সম্পত্তির কোনো অধিকার ছিল না—এই আয়াত তা রদ করেছে।

- “مَّفْرُوضًا” — শব্দটি নির্দেশ করে যে এটি আল্লাহ নির্ধারিত ফরজ বিধান, বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

- মা'আরিফুল কুরআনের ব্যাখ্যায় (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬২) বলা হয়—নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নির্ধারিত হক ইসলাম দিয়েছে।

- এই আয়াত নারীদের সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে।

- মেয়েরা তার পিতা, স্বামী, ভাই, এমনকি সন্তানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অংশীদার।

- সমাজে যারা নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, তারা কুরআনের বিরোধিতা করে।

- নারীর এই আর্থিক স্বাধীনতা তার সম্মান, আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

- এই আয়াত একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে কুরআন নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করেছে।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ(৪:৩২) সূরা নিসা — َ

বাংলা অনুবাদ:

“পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জিত সম্পদের অংশ এবং নারীদের জন্যও রয়েছে তাদের উপার্জিত সম্পদের অংশ।”

বিশ্লেষণ:

- আয়াতটি সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

- “ٱكْتَسَبْنَ” শব্দের অর্থ — নারীরা যা নিজেরা অর্জন করেছে।

- নারী নিজে ব্যবসা, চাকরি, ফ্রিল্যান্সিং, কৃষিকাজ বা হস্তশিল্প যা কিছুতেই উপার্জন করলে তা তার নিজস্ব সম্পত্তি।

- কেউ তার উপার্জন ছিনিয়ে নিতে পারবে না—এটি কুরআনের মৌলিক বিধান।

- মা'আরিফুল কুরআনে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৫) বলা হয়, নারীর আয়কে তাঁর মালিকানায় রেখেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- এই অধিকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে।

- কুরআন নারীকে ঘরবন্দী বা উপার্জনহীন রাখার পক্ষে নয়—বরং উদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানায়।

- এটি ইঙ্গিত দেয়, নারীর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা সমাজের জন্য কল্যাণকর।

- ইসলামে নারীর উপার্জিত অর্থে কাউকে অংশীদার বানানো হয় না—স্বাধীন মালিকানা নিশ্চিত।

- এটি নারীর আর্থিক সুরক্ষা ও মর্যাদার একটি বৈপ্লবিক ঘোষণাস্বরূপ।

৪. অভিভাবকত্ব ও সন্তান লালন-পালনের অধিকার

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًاۖ (২৯:৮) — সূরা আনকাবুত —

বাংলা অনুবাদ:

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি।"

বিশ্লেষণ:

- এই আয়াত পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য স্পষ্ট করলেও, এখানে 'মা' এর মর্যাদা বিশেষভাবে ইঙ্গিতবাহী।

- পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে কুরআন কোন প্রকার লিঙ্গভেদ করেনি।

- মা সন্তান ধারণ, জন্মদান, লালন-পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

- তাই সন্তান লালনে নারীর অধিকার ও কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

- "وَٰلِدَيْهِ" শব্দটি পিতা-মাতা উভয়কে বোঝালেও মা'র গুরুত্ব বহু স্থানে অধিকতর।

- কুরআনের বহু আয়াতে (যেমন: সূরা লুকমান- ১৪) মায়ের কষ্টের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

- মা হিসেবে নারীর দায়িত্ব কেবল পালনযোগ্যই নয়, তা অত্যন্ত মর্যাদার।

- সমাজে সন্তান পালনের কাজকে অবমূল্যায়ন করা কুরআনের নির্দেশনার বিরোধিতা।

- নারীর এই অধিকার তার সমাজ-গঠনের অঙ্গ ও মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু।

- তাই কুরআন সন্তান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে মা'র কর্তৃত্ব ও ভূমিকার গুরুত্ব নিশ্চিত করে।

৩.৪ পারিবারিক জীবনে নারীর অবস্থান

১. বিবাহের অধিকার ও স্বাধীনতা

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

(সূরা বাকারা ২:২৩২)

বাংলা অনুবাদ:

"আর যখন তোমরা নারীকে তালাক দাও, অতঃপর তারা নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রাখো অথবা ভালোভাবে তাদেরকে আলাদা করো। তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য যেন তোমরা তাদেরকে আটকো না। আর যে এ কাজ করবে, সে নিজের প্রতি জুলুম করবে। আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহর তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ করো এবং যেসব কিতাব ও হিকমত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা স্মরণ করো। আল্লাহকে ভয় করো এবং জানো যে আল্লাহ সবকিছু জানেন।"

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

- কুরআনের এই আয়াত নারীকে বিবাহিত জীবনে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করেছে।
- নারীকে তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় তালাক দেওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, যা সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।
- স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার পর তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরি।
- ইসলাম নারীকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে বিবাহিত জীবনে সহযাত্রী হিসেবে দেখতে চায়।

- এই আয়াতে 'মعرف' শব্দের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- আধুনিক সমাজে নারীর স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সম্মান স্থাপনে এই আয়াতের প্রভাব স্পষ্ট।
- বৈবাহিক জীবনে নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে কুরআনে প্রমাণিত।
- যখন কোনও নারী তার স্বামীর দ্বারা বিরুদ্ধ আচরণ দেখে, তখনও ইসলাম তাকে অধিকার প্রদান করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য।
- নারীকে বিবাহিত জীবনে সামাজিক স্বাধীনতা, এমনকি তার নিজের অধিকারও সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত।
- তাফসীর ইবনে কাসীর (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৩) অনুযায়ী, এই আয়াত নারীর আইনি অধিকারকে সুনিশ্চিত করে এবং তার প্রতি জুলুমের বিরোধিতা করে।

২. মোহরানার অধিকার

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

(সূরা নিসা 8:8, 8:২০-২১)

বাংলা অনুবাদ:

"আর তোমরা নারীদের মেহর (মোহর) তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দাও, যদি তারা নিজেদের ইচ্ছায় কিছু অংশ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়, তবে তা সুস্বাদু ও সুস্থভাবে গ্রহণ করো।"

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

১. কুরআনে মোহরানার অধিকার নারীদের স্বতন্ত্র সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. এই আয়াত নারীর আর্থিক অধিকারকে সুরক্ষিত করে, যার মাধ্যমে তিনি তার মৌলিক অধিকার লাভ করেন।

৩. নারীকে মৌলিক ভাবে তার স্বামী থেকে মোহর প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে, যা তার সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি।

৪. মোহর প্রদানে পুরুষদের দায়িত্ব নির্ধারিত এবং এটি একটি ন্যায়সঙ্গত, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ।

৫. মোহরনার একদিকে ইস্তিরাহাত এবং অন্যদিকে তার আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

৬. ইসলামে মোহরনার অধিকার নারীর ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি এবং তার আত্মবিশ্বাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৭. মোহর শুধুমাত্র এক ধরনের আর্থিক উপহার নয়, বরং এটি নারীর সামাজিক মর্যাদাও

প্রতিষ্ঠা করে।

৮. আধুনিক সমাজে মোহরনার অধিকার নারীর আর্থিক স্বাধীনতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণিত ব্যবস্থা।

৯. মোহরনার অধিকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়ক, যা সমাজে নারীর শক্তি এবং স্বাধীনতা প্রতিফলিত করে।

১০. তাফসীর মাওয়ারীফুল কুরআন (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৫৬) মতে, এই আয়াত মোহরনার গুরুত্ব এবং এটি নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩. মাতৃত্বের মর্যাদা

আয়াত ১ :

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۚ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ **(সূরা লুকমান ৩১:১৪)**

বাংলা অনুবাদ:

"আমরা মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ করেছি। তার মা তাকে দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে, এবং তার দুধ ছাড়ানোর সময় দু'বছর হয়ে যায়। তুমি আমার এবং তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং তোমার শেষ পরিণতি আমার কাছে।"

আয়াত ২:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۚ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, **(সূরা আহকাফ ৪৬:১৫)**

- কুরআনের এই আয়াত নারীকে বিবাহিত জীবনে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করেছে।
- নারীকে তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় তালাক দেওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, যা সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।
- স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার পর তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরি।
- ইসলাম নারীকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে বিবাহিত জীবনে সহযাত্রী হিসেবে দেখতে চায়।
- এই আয়াতে 'মعرف' শব্দের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- আধুনিক সমাজে নারীর স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সম্মান স্থাপনে এই আয়াতের প্রভাব স্পষ্ট।
- বৈবাহিক জীবনে নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে কুরআনে প্রমাণিত।
- যখন কোনও নারী তার স্বামীর দ্বারা বিরুদ্ধ আচরণ দেখে, তখনও ইসলাম তাকে অধিকার প্রদান করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য।

- নারীকে বিবাহিত জীবনে সামাজিক স্বাধীনতা, এমনকি তার নিজের অধিকারও সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত।
- তাফসীর ইবনে কাসীর (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৩) অনুযায়ী, এই আয়াত নারীর আইনি অধিকারকে সুনিশ্চিত করে এবং তার প্রতি জুলুমের বিরোধিতা করে।

৪.বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক সংক্রান্ত বিধান-

" ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحٌۢ بِإِحۡسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَنۡ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَنۡ لَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِي مَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ **"(সূরা বাকারা ২:২২৯-২৩২)**

বাংলা অনুবাদ:

"তালাক দুটি পর্যন্ত বৈধ। এরপর আপনি যদি তাদের ধরে রাখতে চান, তা তো ভালোভাবে করা উচিত, অথবা ভালোভাবে তাদের বিদায় জানানো উচিত। আর আপনাদের পক্ষে তাদের দেওয়া কিছু কিছুর দাবি করা বৈধ নয়, যদি না তারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু যদি আপনাদের মধ্যে ভয় হয় যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থাপন করতে পারবে না, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই যদি তারা কোনো পরিমাণ শোধদাবি গ্রহণ করে। এটাই আল্লাহর বিধি। তাদেরকে এ বিধি অতিক্রম করতে দেয়া উচিত নয়।"

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

১. এই আয়াতে তালাকের প্রাথমিক বিধান এবং শর্তগুলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. তালাকের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুইজনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রাখা উচিত।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্কটি বজায় রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৪. তালাকের পরেও একে অপরকে সম্মান দেখানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যেখানে স্ত্রীর একমাত্র আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা পুরুষের হাতেই থাকে।

৫. আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তালাকের পর কোনো কিছু দাবি করা উচিত নয়", তবে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট শোধদাবি গ্রহণ করা বৈধ।

৬. এসব বিধি নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে সাহায্য করে, যাতে তিনি কোনো শোষণের শিকার না হন।

৭. আল্লাহ তাআলা এখানে মানুষের আবেগ, সঠিক বিচারের প্রতি এক ধরনের সতর্কতা দিয়েছেন।

৮. ইসলামী শরিয়তে, একজন স্ত্রী ও স্বামী একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং তাদের

আচরণে ন্যায় ও সদাচরণ বজায় রাখতে হবে।

৯. আধুনিক সমাজে, যেখানে মানুষ একে অপরের প্রতি শোষণমূলক আচরণ করছে, এ আয়াতটি প্রতিকার এবং শৃঙ্খলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

১০. সম্পর্কের শেষে আল্লাহর বিধি অতিক্রম করা যাবে না, যদি তা সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি বা অন্যায় সৃষ্টি করে।

অধ্যায় ৪. হাদীসে নারীর সম্মান ও অধিকার

৪.১ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবনে নারীদের প্রতি আচরণ

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় হাদীস এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশেষত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও ন্যায়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, স্নেহময় পিতা, এবং নারীদের সম্মানিত ও সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা নেতা।

১. স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণ

□ হাদীস :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজের পরিবারের (স্ত্রীর) সাথে উত্তম আচরণ করে। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য উত্তম।

তিরমিজি, হাদীস: 3895 (সহীহ)

□ হাদীস :

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يُصْغِي إِلَى زَوْجَاتِهِ وَيَسْمَعُ شَكْوَاهُنَّ"

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করতেন। **(সহীহ মুসলিম, হাদীস 1479)**

এটি প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল মৌলিক দাওয়াতদাতা ছিলেন না; বরং স্ত্রীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল নম্র, সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্র। তিনি ঘরে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন (বুখারী, 676), কখনো গলা তোলেননি। অনেক ক্ষেত্রে সাহাবিয়াগণ বা স্ত্রীগণ কোনো বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করলে রাসূল (সা.) ধৈর্য সহকারে শুনতেন ও শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া দিতেন।

২. কন্যাদের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন

□ হাদীস : "فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرْبِبُنِي مَا يُرِيبُهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا"

অর্থ: ফাতিমা আমার শরীরেরই অংশ। সে যে বিষয়ে কষ্ট পায়, তাতে আমিও কষ্ট পাই।*সহীহ বুখারী: 3714, সহীহ মুসলিম: 2449*

□ **হাদীস :**

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)'। (মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)

এই হাদীসটি দু'টি সাহিহ কিতাবে এসেছে। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস নারীদের প্রতি দয়ার নিদর্শন ও পিতৃস্নেহের সর্বোচ্চ রূপ। রাসূল (সা.) ফাতিমা (রা.) ঘরে এলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমু দিতেন এবং নিজের পাশে বসাতেন (তিরমিজি, 3872)।

৩. অন্যান্য নারী সাহাবীদের সাথে ব্যবহার

□ **হাদীস :**একবার এক মহিলার ছেলে শহীদ হলে সে রাসূল (সা.) এর কাছে এসে কান্না করছিল। তিনি তাঁকে না থামিয়ে কাঁদার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং বলেন:

"إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى"

অর্থ: ধৈর্য তো প্রথম আঘাতের সময়ই প্রকাশ পায়। *সহীহ বুখারী: 1283*

এখানে নারীর মানসিক অবস্থার প্রতি সহানুভূতি ও বুঝাশক্তির প্রকাশ স্পষ্ট। নবীজি তাঁকে তিরস্কার না করে মমতার সাথে উপদেশ দেন।

□ **হাদীস :**

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

(সাহাবি: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.)"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদের নামাজে শরিক হয়েছিলাম। তিনি প্রথমে নামাজ পড়ালেন, তারপর খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে তিনি নারীদের দিকে গেলেন, তাদের উপদেশ দিলেন, আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে দান-সদকা করতে উৎসাহিত করলেন।" *সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮৮৫*

এই দৃষ্টান্তে নারীদের আলাদা গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান দেওয়া ও আর্থিক দায়িত্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে নারীদের প্রতি সম্মান, স্নেহ, ন্যায় এবং শিক্ষাদান ছিল অগ্রগণ্য। তিনি কখনো নারীদের অবহেলা করেননি, বরং তাঁদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ছিলেন সর্বাগ্রে। স্ত্রীদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কন্যাকে ভালোবাসতেন, আর সাহাবিয়াদের সঙ্গে সমানভাবে আচরণ করতেন।

৪.২: নারী শিক্ষা সম্পর্কিত হাদীস-

১.জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ:

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ ছিল ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি পুরুষ ও নারীদের উভয়ের জন্যই জ্ঞান অর্জনকে ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এটি নারীদের শিক্ষা ও সমাজে তাঁদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

হাদীস:আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"**طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ**"

"জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিম পুরুষ ও নারীর ওপর ফরজ।" *ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২২৪*

এই হাদীসটি ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও নারীদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং তা সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখত।

২.নারী সাহাবীদের উল্লেখযোগ্য অবদান-

আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.):

- তিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর স্ত্রী এবং ইসলামের অন্যতম প্রধান শিক্ষিকা।
- ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক।
- ফিকহ, তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান অসাধারণ ছিল।
- আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন: "আমরা যখনই কোনো হাদীসের বিষয়ে সমস্যায় পড়তাম, আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাদের সমাধান দিতেন।"
- তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

শিফা বিনতে আবদিল্লাহ (রা.):

- তিনি ছিলেন আরবের শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী শ্রেষ্ঠ নারী সাহাবিদের একজন।
- জাহেলি যুগেও তিনি পড়ালেখা জানতেন।

- নবী (সা.) তাঁকে হাফসা (রা.)-এর শিক্ষিকা নির্ধারণ করেন।

- লেখা শেখানোর পাশাপাশি ঘা উপশমের রুকইয়াও শিক্ষা দিতেন।

- তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসকও।

উম্মে আম্মারা (নাসিবা বিনতে কা'ব) (রা.):

- তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা ও শিক্ষিকা।

- উহুদের যুদ্ধে তিনি নবী (সা.)-কে রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে লড়াই করেন।

- তাঁর কাছে সাহাবীরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

- তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মা ও শিক্ষিকা

নবী (সা.)-এর যুগে নারী সাহাবীরা শুধুমাত্র ঘরকন্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তাঁরা শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অবদান ইসলামী শিক্ষার বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের জীবন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নারীরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাঁদের অবদান আমাদের সমাজে অম্লান থাকবে।

৪.৩ – পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত হাদিস

ইসলামে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির মূল স্তম্ভ। নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে পারিবারিক জীবনকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং তাঁর হাদীসে এটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১. বিবাহ সম্পর্কিত শিক্ষা

বিবাহ ইসলামে একটি পবিত্র বন্ধন, যা দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, এবং এটি একে অপরের অধিকার ও দায়িত্ব পালনের উপর ভিত্তি করে। নবী (সা.) বিবাহকে একজন মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

হাদীস: আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা.) বলেছেন: 'বিবাহ একটি সুনত (আদর্শ)। তাই যারা বিয়ে করতে সক্ষম, তারা বিবাহ করবে, কারণ এটি তাদের দৃষ্টিকে নযর (দৃষ্টি থেকে অশ্লীলতা) থেকে রক্ষা করবে এবং পায়ের মাধ্যমে সম্মান এবং বিশ্বাসের মধ্যে থাকবে।'" *সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪৬৬*

নবী (সা.) এই হাদীসে বলেন যে, বিবাহের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রাকে সংযত রাখবে। বিবাহ সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে।

২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, যা মেনে চললে দাম্পত্য জীবনে সুখ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী (সা.) তাঁর হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা দাম্পত্য সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে।

হাদীস:আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

"নবী (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠ, এবং আমি (সা.) আমার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে ভালো আচরণ করেছি।'" *তিরমিজি, হাদীস: ৩২১০*

নবী (সা.) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দাম্পত্য জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসা ও সম্মান দেখায়। এটি মুসলিম সমাজে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।

৩. মাতৃত্বের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদিস

মাতৃত্ব ইসলামে অত্যন্ত সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে। নবী (সা.) মাতৃত্বের গুরুত্ব এবং মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং যত্নের নির্দেশ দিয়েছেন, যা মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদাকে আরও শক্তিশালী করে।

হাদীস:আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার মাকে স্বর্গে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারব?' নবী (সা.) বললেন: 'তোমার মা যদি এখনও জীবিত থাকে, তবে তার সেবা করো, কারণ স্বর্গ তার পায়ের নিচে রয়েছে।'"

সুনান নাসাঈ, হাদীস: ৩১২৫

নবী (সা.) মাতৃত্বের মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং মায়ের সেবা ও শ্রদ্ধা স্বর্গে উঠার পথ হিসেবে দেখেছেন। এটি ইসলামে মাতৃত্বের মর্যাদা ও নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পারিবারিক জীবনে আদর্শ স্বামী, পিতা এবং নেতা হিসেবে তাঁর অনুসারীদের জন্য এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর হাদীসগুলো দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের গুরুত্ব, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং মাতৃত্বের মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামে পারিবারিক জীবন একটি প্রতিষ্ঠিত মৌলিক স্তম্ভ, যা সমাজের উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৪ – সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে হাদিস

ইসলামে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে নারীদেরকে শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব পালন নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান সুযোগ দিয়েছেন। এটি ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং তার সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। নবী (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান, ব্যবসায়, সম্পত্তির অধিকার এবং সামাজিক অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে, যা মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে।

১. নারীর কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়

ইসলামে নারীকে কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। নারীদের কর্মজীবন, অর্থ উপার্জন এবং ব্যবসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবী (সা.)-এর যুগে এমন অনেক নারী ছিলেন যারা সফলভাবে ব্যবসা করেছেন, যেমন, হাদীজা (রা.) যিনি নবী (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন এবং একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলামে ব্যবসা এবং অর্থ উপার্জনকে বৈধ করা হয়েছে, তবে তা যেন শরিয়তসম্মত হয় এবং হালাল উপার্জন হয়।

হাদীস:আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

"নবী (সা.) বলেছেন: 'প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম মহিলার জন্য বৈধ যে তারা নিজের আয় উপার্জন করবে, তবে এটি হারাম উপার্জন হতে হবে না।' *সহীহ বুখারি, হাদীস: ২০৮৮'*

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামে পুরুষ ও মহিলাকে তাদের নিজস্ব উপার্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং তা হালাল উপার্জন হতে হবে। নারীরা তাদের পরিবারকে সমর্থন করতে পারে এবং সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারে।

২. সম্পত্তি অধিকার প্রতিষ্ঠায় হাদিসের ভূমিকা

ইসলামে নারীদের সম্পত্তি অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা ছিল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইসলামের আগের যুগে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু নবী (সা.)-এর যুগে তা পরিবর্তিত হয়। নারীদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়, যা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করে।

হাদীস:আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

"নবী (সা.) বলেছেন: 'নারীরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হালালভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং তা তাদের সম্পূর্ণ অধিকার।' *সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১০৪*

এটি নারীদের সম্পত্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তা যে তাদের স্বতন্ত্র অধিকার, এটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। নারীরা তাদের সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী এবং তারা তা ব্যবহারে স্বাধীন। এটি নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে।

৩. সামাজিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত নির্দেশনা

ইসলামে নারীদের সামাজিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী (সা.) নারীদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং তাদের সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। মহিলাদের সমাজে তাদের প্রাপ্য সম্মান এবং অধিকার প্রদান করে ইসলাম তাদেরকে কর্মরত, শিক্ষিত এবং শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে তৈরি করেছে। নবী (সা.)-এর যুগে নারীরা মসজিদে আসতেন, ইসলামি দাওয়াত ও শিক্ষা প্রচার করতেন, এবং সমাজের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতেন।

হাদীস:উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত:

"একদিন এক মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরও কি কোন অধিকার আছে?' নবী (সা.) বলেছেন: 'তোমাদেরও পুরুষদের মতো অধিকার রয়েছে, শুধু তোমরা তোমাদের কাজ সঠিকভাবে করবে।' *সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৩৮১*

এই হাদীসে নবী (সা.) বলেন, নারীদের পুরুষদের মতো অধিকার রয়েছে, এবং তাঁরা সমাজে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি নারীদের সামাজিক অংশগ্রহণের গুরুত্বকে এবং সমতার প্রস্তাবনা দেয়।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাচরণে নারীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর হাদীসগুলো নারীদের কর্মসংস্থান, ব্যবসা, সম্পত্তির অধিকার এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। ইসলাম নারীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা তাদের সম্মান, মর্যাদা এবং আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে। নবী (সা.)-এর যুগে নারীরা যেমন ব্যবসা এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, তেমনি তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলাম নারীদেরকে তাদের প্রকৃত ক্ষমতা এবং অধিকার উপলব্ধি করাতে সাহায্য করেছে, যা মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অধ্যায় ৫: ইসলামী আইনে (ফিকহে হানাফি) নারীর অধিকার

৫.১ বিবাহ সম্পর্কিত আইন:

১) বিবাহের শর্তাবলী ও জরুরি উপাদান

মূল আরবি বক্তব্য:

وأركان النكاح هي الإيجاب والقبول. والإيجاب ما صدر من ولي المرأة أو منها في حالة تزويجها نفسها، والقبول ما صدر من الزوج أو وكيله. وشروط انعقاد النكاح أن يكون بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين إذا كان المتزوجان مسلمين، سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المراد به النكاح.

বাংলা অনুবাদ: "বিবাহের রুকন (মূল উপাদান) হল ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (গ্রহণ)। ইজাব হল নারীর অভিভাবক কর্তৃক বা নারী নিজে যখন নিজেকে বিবাহ দেন তখন তার পক্ষ থেকে উচ্চারিত বাক্য, আর কবুল হল স্বামী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক উচ্চারিত বাক্য। বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্তাবলী হল: দুজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান, মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতিতে হওয়া (যদি বিবাহকারী উভয়ই মুসলিম হন), যারা চুক্তিকারীদের কথা শুনতে পান এবং বুঝতে পারেন যে তা বিবাহের উদ্দেশ্যে।**উৎস:** আল-হিদায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০

মূল আরবি বক্তব্য:

والنكاح لا ينعقد مع خلو المجلس عن الشهود، وكذلك لا ينعقد في حال السكر، ولا في حال الإكراه، ولا بالهزل، ولا مع الجهل بالمعنى، وهو أن لا يعلم أن المراد اللغوي لكلمتي الإيجاب والقبول هو عقد الزواج.

বাংলা অনুবাদ: "বিবাহ সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় না। তেমনি, মাতাল অবস্থায়, জোরপূর্বক, ঠাট্টাচ্ছলে অথবা অর্থের অজ্ঞতার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয় না - যার অর্থ হল, ইজাব ও কবুল শব্দের ভাষাগত উদ্দেশ্য বিবাহ চুক্তি তা না জানা।"**উৎস:** বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩২

মূল আরবি বক্তব্য:

ولا يجوز أن يزوج الأب ابنته البالغة العاقلة بغير رضاها، وإذا زوجها فلها أن ترد النكاح، وأما البكر البالغة العاقلة فالأولى أن لا يزوجها إلا بإذنها، وإذنها صمتها.

বাংলা অনুবাদ: "পিতার জন্য তার প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন কন্যাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়। যদি তিনি তাকে বিবাহ দেন, তবে কন্যার বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। আর প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন কুমারী কন্যার ক্ষেত্রে উত্তম হল তাকে তার অনুমতিতে বিবাহ দেওয়া, এবং তার অনুমতি হচ্ছে তার নীরবতা।"**উৎস:** আল-মাবসূত লিস সারাখসি, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২

ব্যাখ্যা: হানাফি মাযহাবে বিবাহের মূল উপাদান এবং শর্তাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি নারীর মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করে। হানাফি মাযহাব বিবাহকে একটি চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে দুই পক্ষের ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) অপরিহার্য। এই মাযহাবে বিবাহের

সম্পূর্ণতার জন্য চারটি মূল শর্ত রয়েছে: (১) ইজাব ও কবুল, (২) দুইজন পুরুষ সাক্ষী অথবা এক পুরুষ ও দুই নারী সাক্ষী, (৩) উভয় পক্ষের সম্মতি, এবং (৪) মোহরানা নির্ধারণ।

হানাফি মাযহাবে নারীর বিবাহ সংক্রান্ত অধিকারে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী নিজের বিবাহে সম্মতি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখেন। পিতা বা অন্য অভিভাবক তার সম্মতি ছাড়া তাকে বিবাহ দিতে পারেন না। যেখানে শাফেঈ ও মালিকি মাযহাবে কুমারী মেয়ের বিবাহে অভিভাবকের ভূমিকা আবশ্যক, সেখানে হানাফি মাযহাব একজন প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান নারীকে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করার অধিকার দেয়।

হানাফি মাযহাবে সাক্ষীদের উপস্থিতি বিবাহের বৈধতার জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি বিবাহকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং দাম্পত্য অধিকার ও দায়িত্বগুলি সুরক্ষিত করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মত দক্ষিণ এশীয় সমাজে যেখানে হানাফি মাযহাব অনুসরণ করা হয়, সেখানে বিবাহ নিবন্ধন আইনি শর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

হানাফি মাযহাবে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করে বিবাহ অবৈধ। "ইকরাহ" বা বাধ্যকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন কোনো বিবাহ বৈধ নয়। বাস্তব উদাহরণে, যদি কোনো পরিবার তাদের কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে বাধ্য করে, তবে ইসলামী আদালতে বা কাজি আদালতে সেই বিবাহ বাতিল হতে পারে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী বিবাহের চুক্তিতে উভয় পক্ষের স্বাধীন সম্মতি নিশ্চিত করে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে সম্মান দেখানো হয়েছে।

হানাফি মাযহাবে একজন কন্যার বিবাহের সম্মতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীলতা দেখানো হয়েছে। কুমারী কন্যার ক্ষেত্রে নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয়, যা লজ্জাশীলতার সামাজিক প্রথাকে বিবেচনায় নেয়। তবে যদি তিনি স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে তা অবশ্যই মান্য করতে হবে। অন্যদিকে, যিনি পূর্বে বিবাহিত ছিলেন তার ক্ষেত্রে স্পষ্ট মৌখিক সম্মতি আবশ্যক।

এই বিধানগুলি প্রমাণ করে যে হানাফি মাযহাব নারীকে তার বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মতামতকে শ্রদ্ধা করা এবং জোরপূর্বক বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হানাফি ফিকহের সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির প্রতিফলন।

২) মোহরানা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকার

মূল আরবি বক্তব্য:

المهر حق واجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو بالدخول الحقيقي، ولا حد لأقل المهر، ولا لأكثره، ويصح التزوج على مهر قليل أو كثير، مما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة، وهو ملك المرأة، يجب عليها به ما يجب بسائر أموالها.

বাংলা অনুবাদ: "মোহর হল বিবাহ বা বাস্তব সহবাসের কারণে পুরুষের উপর নারীর অপরিহার্য অধিকার। মোহরের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই। যা মূল্য বা পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তা কম বা বেশি যেকোনো পরিমাণে মোহর হিসেবে নির্ধারণ

করা যায়। এটি নারীর সম্পত্তি, যার উপর তার অন্যান্য সম্পত্তির মতোই অধিকার থাকে।"**উৎস:** আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১০

মূল আরবি বক্তব্য:

ولها النفقة وهي حق الزوجة على زوجها من طعام وكسوة وسكنى، وهي واجبة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وتقدر نفقة المرأة حسب حال الزوج يسرا وعسرا، وتجب النفقة للزوجة ولو كانت موسرة.

বাংলা অনুবাদ: "নারীর ভরণপোষণের অধিকার আছে, যা স্বামীর উপর স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার। এটি কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ এবং উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্বামীর উপর স্ত্রীর অপরিহার্য অধিকার। স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এবং স্ত্রী সম্পদশালী হলেও তার ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব।"**উৎস:** মুখতাসার আল-কুদূরী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৫

মূল আরবি বক্তব্য:

وللمرأة حق في أن تكتب في عقد زواجها ما شاءت من الشروط التي تحقق مصلحتها، مما ليس فيه منافاة لمقتضى العقد، ولا محرما شرعا. كاشتراطها عليه أن لا يسافر بها إلى بلد آخر، أو لا يتزوج عليها، أو أن يجعل لها حق الطلاق، ونحو ذلك.

বাংলা অনুবাদ: "নারীর অধিকার আছে তার বিবাহ চুক্তিতে নিজের স্বার্থ রক্ষাকারী যে কোনো শর্ত লিখে নেওয়ার, যতক্ষণ তা চুক্তির মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী না হয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ না হয়। যেমন, তিনি শর্ত আরোপ করতে পারেন যে স্বামী তাকে অন্য দেশে নিয়ে যাবে না, বা তার উপর দ্বিতীয় বিবাহ করবে না, অথবা তাকে তালাকের অধিকার দেবে, ইত্যাদি।"**উৎস:** রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫০

ব্যাখ্যা: হানাফি মাযহাবে মোহরানা বিবাহের একটি অপরিহার্য উপাদান এবং এটি নারীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার। মোহর নারীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যার উপর পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তার। এটি বিবাহ চুক্তিতে পুরুষের দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক নিশ্চয়তা যা নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হানাফি মাযহাবে মোহরের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত নেই, তবে এটি অবশ্যই মূল্যবান হতে হবে।

হানাফি ফিকহ অনুসারে মোহর দুই প্রকার: মোহরে মুআজ্জাল (অগ্রিম মোহর) এবং মোহরে মুয়াজ্জাল (বিলম্বিত মোহর)। প্রথমটি বিবাহের সময় প্রদেয়, আর দ্বিতীয়টি বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুতে প্রদেয়। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে, বিশেষত বাংলাদেশ ও ভারতে হানাফি মতে মোহরে মুয়াজ্জাল একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে, যা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

হানাফি মাযহাবে নারীর ভরণপোষণের অধিকারও বিশেষভাবে সুরক্ষিত। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। এই মাযহাবের বিশেষত্ব হল যে স্ত্রী নিজে ধনী হলেও স্বামী তার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। ভরণপোষণের পরিমাণ স্বামীর

আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তবে তা অবশ্যই মানসম্মত জীবনযাপনের পর্যাপ্ত হতে হবে।

হানাফি ফিকহে নারীর সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারও উল্লেখযোগ্য। বিবাহিত অবস্থায় নারী তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা বজায় রাখেন এবং সেই সম্পত্তি ব্যবহার, বিক্রয় বা দান করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকে। স্বামীর সেই সম্পত্তিতে কোনো আইনি অধিকার নেই। এটি অন্যান্য আইনি ব্যবস্থার তুলনায় একটি অগ্রগামী অবস্থান, যেখানে বিবাহে নারীর সম্পত্তি স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

এছাড়া, নারী তালাক-ই-তাফবিজ বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের অধিকারও চাইতে পারেন, যা তাকে নির্দিষ্ট শর্তাধীনে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের মুসলিম পারিবারিক আইনে এই হানাফি নীতিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ অনুসারে, সমস্ত মুসলিম বিবাহে মোহর নির্ধারণ ও নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আধুনিক যুগে, হানাফি মাযহাবের এই বিধানগুলি মুসলিম নারীদের আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩) পাত্র নির্বাচনে নারীর অধিকার

মূল আরবি বক্তব্য:

والمرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض، فللقاضي فسخ النكاح بطلب الأولياء، فإن رضوا بعد ذلك صح النكاح. والكفاءة تكون في النسب والدين والمال والحرفة.

বাংলা অনুবাদ: "যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান নারী নিজেকে অসমান (গাইর কুফু) ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তবে অভিভাবকদের আপত্তি জানানোর অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে কাজি অভিভাবকদের অনুরোধে বিবাহ বাতিল করতে পারেন। তবে পরবর্তীতে যদি অভিভাবকগণ সম্মত হন, তবে বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে। কাফাআত বা সমতা বংশ, ধর্মীয় অনুশীলন, আর্থিক অবস্থা ও পেশাগত দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।"**উৎস:** আল-হিদায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৭

মূল আরবি বক্তব্য:

وإذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة من غير كفء بغير رضاها، فلها حق الاعتراض عليه وفسخ النكاح. وإذا زوجها وليها من غير الأب والجد من كفء فلا يصح إلا برضاها.

বাংলা অনুবাদ: "যদি পিতা তার প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান কন্যাকে তার সম্মতি ছাড়া কোনো অসমান ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন, তবে সেই কন্যার আপত্তি জানানো এবং বিবাহ বাতিল করার অধিকার রয়েছে। আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক তাকে সমান পাত্রের সাথে বিবাহ দেন, তবে তার সম্মতি ছাড়া তা বৈধ হবে না।"**উৎস:** বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২

মূল আরবি বক্তব্য:

إذا خطب إليها رجلان أحدهما صاحب دين وخلق حسن، والآخر صاحب مال، فينبغي تقديم ذي الدين... وقال أيضا: ثلاث إذا منعتهن ابنتك فقد ظلمتها: تمنعها الزواج إذا أتاها الخاطب إذا رضيت خلقه ودينه، وتحبس عنها العلم، وتكرهها على الزوج.

বাংলা অনুবাদ (চলমান): "যদি দুজন পুরুষ কোনো নারীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে, একজন ধার্মিক ও সৎচরিত্র এবং অন্যজন ধনবান, তাহলে ধার্মিক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত... তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা.)] আরও বলেছেন: তিনটি বিষয়ে যদি তুমি তোমার কন্যাকে বাধা দাও, তবে তুমি তার প্রতি অবিচার করেছ: যখন কোনো পাত্র আসে যার চরিত্র ও ধর্মাচরণ সে পছন্দ করে, তখন তাকে বিবাহে বাধা দেওয়া, তার থেকে জ্ঞান আটকে রাখা, এবং তাকে কোনো স্বামীর প্রতি বাধ্য করা।"**উৎস:** কিতাবুল আসল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৩

ব্যাখ্যা: হানাফি মাযহাবে পাত্র নির্বাচনে নারীর অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাযহাবে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান নারী নিজের জীবনসঙ্গী বাছাই করার অধিকার রাখেন। প্রাচীন হানাফি ফিকহ গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত বিধানগুলি দেখায় যে, নারীর এই অধিকারের স্বীকৃতি সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক সম্মানের সাথে ভারসাম্য রেখে প্রদান করা হয়েছে।

হানাফি মাযহাবে 'কাফাআত' বা সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা বিবাহে উভয় পক্ষের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতা নির্দেশ করে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কাফাআত পাঁচটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়: (১) বংশ বা বংশমর্যাদা, (২) ইসলাম গ্রহণের পুরাতনত্ব, (৩) ধার্মিকতা, (৪) পেশা বা কর্ম, এবং (৫) সম্পদ বা ধনসম্পত্তি। একজন নারী নিজে চাইলে অসমান ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু তার অভিভাবকদের আপত্তি জানানোর অধিকার থাকে। তবে যদি অভিভাবকগণ পরবর্তীতে সম্মতি দেন, তবে বিবাহ বৈধ হয়ে যায়।

হানাফি মাযহাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া কোনো অভিভাবকেরই অধিকার নয়, এমনকি পিতারও নয়। পিতা যদি তার কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অসমান পাত্রের সাথে বিবাহ দেন, তবে কন্যার সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। এটি অন্যান্য মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, যেখানে পিতার অধিকার অধিকতর।

উল্লেখিত হাদিসে পাত্র নির্বাচনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সম্পদ ও বৈষয়িক সফলতার চেয়ে ধার্মিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এটি বিবাহের সুস্থ বুনিয়াদ স্থাপনে অর্থনৈতিক বিষয়ের চেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানদণ্ডের গুরুত্ব তুলে ধরে।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের হানাফি অনুসারী সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে পাত্র নির্বাচনে পারিবারিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও, হানাফি ফিকহের আলোকে নারীর পাত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত। আধুনিক সময়ে, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই হানাফি বিধান অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অনেক মুসলিম সমাজে এখন যুবতীরা উচ্চশিক্ষা ও

পেশাগত জীবনে অংশ নিচ্ছে, যা তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সাহায্য করছে।

হানাফি মাযহাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনে নারীর অধিকার এবং অভিভাবকের আপত্তির অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করা, যেখানে নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দও বিবেচনায় নেওয়া হয়। ইসলামী ফিকহের এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও পারিবারিক মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, হানাফি ফিকহে বিবাহপূর্ব সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের অনুমতি আছে, যাতে পাত্র-পাত্রী একে অপরকে জানার সুযোগ পায়। এটি জীবনসঙ্গী নির্বাচনে নারীর সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করে। তবে এই সাক্ষাৎ শালীনতা ও পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার সীমার মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান যুগে, বাংলাদেশের অনেক পরিবারে হানাফি ফিকহের এই নীতি অনুসরণ করে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং পারিবারিক অনুমোদনের সমন্বয় সাধন করা হয়।

৫.২ তালাক ও অন্যান্য বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

১) তালাকের বিভিন্ন ধরন ও প্রক্রিয়া

মূল আরবি বক্তব্য:

الطلاق على نوعين: طلاق السنة وطلاق البدعة. فطلاق السنة: أن يطلقها تطليقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد، أو يطلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

বাংলা অনুবাদ: "তালাক দুই প্রকার: তালাকে সুন্নত এবং তালাকে বিদআত। তালাকে সুন্নত হল: তিনি তাকে একটি তালাক দেন, এমন পবিত্রতার সময়ে যখন তিনি তার সাথে সহবাস করেননি, তারপর তিনি তাকে ছেড়ে দেন যতক্ষণ না তার ইদ্দত শেষ হয়। তালাকে বিদআত হল: তিনি তাকে একসাথে তিন তালাক দেন, অথবা একই পবিত্রতার সময়ে তিন তালাক দেন, অথবা তিনি তাকে তালাক দেন ঋতুস্রাবের সময়, অথবা এমন পবিত্রতার সময়ে যখন তিনি তার সাথে সহবাস করেছেন।"**উৎস:** আল-হিদায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২০

মূল আরবি বক্তব্য:

الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته في العدة بلا عقد جديد. والطلاق البائن هو الذي لا يملك فيه الزوج مراجعة زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإن كان طلاق واحدة أو اثنتين، فهو بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وإن كان ثلاثا، فهو بائن بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

বাংলা অনুবাদ: "রাজঈ তালাক হল: যেখানে স্বামী ইদ্দতকালে নতুন নিকাহ ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। বায়েন তালাক হল: যেখানে স্বামী নতুন নিকাহ ও নতুন মোহর ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। যদি এটি একটি বা দুটি তালাক হয়, তবে তা বায়েন-ই-সুগরা (ছোট বিচ্ছেদ), যেখানে তিনি তাকে নতুন নিকাহ ও মোহর ছাড়া ফিরিয়ে নিতে পারেন না। আর যদি তিন তালাক হয়, তবে তা বায়েন-ই-কুবরা (বড় বিচ্ছেদ), যেখানে সে অন্য স্বামীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না।" **উৎস:** আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড **১**, পৃষ্ঠা ৩৪৪

মূল আরবি বক্তব্য:

ويملك الرجل تفويض الطلاق إلى امرأته، فيقول: طلّقي نفسك، أو أمرك بيدك، أو اختاري... فإذا طلقت نفسها في المجلس، وقع الطلاق، وإن قامت من المجلس قبل أن تطلق نفسها بطل التفويض... وإذا علق الطلاق بشرط، فوُجد الشرط وقع الطلاق.

বাংলা অনুবাদ: "পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে, যেমন সে বলতে পারে: 'নিজেকে তালাক দাও', বা 'তোমার বিষয় তোমার হাতে' অথবা 'তুমি বেছে নাও'... যদি সে (স্ত্রী) সেই মজলিসেই নিজেকে তালাক দেয়, তবে তালাক ঘটে যাবে, আর যদি সে মজলিস থেকে উঠে যায় নিজেকে তালাক দেওয়ার আগে, তবে সেই অর্পিত ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে... আর যদি তিনি তালাককে কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং সেই শর্ত পূরণ হয়, তবে তালাক ঘটে যাবে।" **উৎস:** বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা **১১৩**

ব্যাখ্যা: হানাফি মাযহাবে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ একটি জটিল ও সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত। হানাফি ফিকহ তালাকের বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের অনিবার্য সমস্যাগুলির সমাধান সুনির্দিষ্ট নিয়মে হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হানাফি ফিকহে তালাককে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: তালাকে সুন্নত (যা শরীয়ত সম্মত) এবং তালাকে বিদআত (যা শরীয়ত বিরোধী)। তালাকে সুন্নত আবার দুই প্রকার: আহসান (সর্বোত্তম) ও হাসান (উত্তম)। তালাকে আহসান হল একটি পবিত্রতার সময়ে (যখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করেননি) একবার তালাক দেওয়া এবং ইদ্দতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত আর তালাক না দেওয়া। তালাকে হাসান হল প্রতিটি পবিত্রতার সময়ে একটি করে মোট তিনটি তালাক দেওয়া। হানাফি মাযহাব এই দুই ধরনের তালাককে বৈধ মনে করে, কিন্তু তালাকে আহসানকে সর্বাধিক উত্তম বলে মনে করে, কারণ এতে পুনর্মিলনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে।

অন্যদিকে, তালাকে বিদআত হল ঋতুস্রাবের সময়ে তালাক দেওয়া, অথবা একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করা, অথবা এমন পবিত্রতার সময়ে তালাক দেওয়া যখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করেছেন। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, এই ধরনের তালাক যদিও নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ, তবুও

তা কার্যকর হয়। শাফেঈ ও মালিকি মাযহাবের বিপরীতে, হানাফি মতে একবারে তিন তালাক দিলে তা তিনটিই গণনা করা হয়, যা বিবাহ বিচ্ছেদকে চূড়ান্ত করে।

তালাককে প্রভাব অনুযায়ী দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: রাজঈ (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) ও বায়েন (চূড়ান্ত)। রাজঈ তালাকের ক্ষেত্রে, স্বামী ইদ্দতকালের মধ্যে নতুন নিকাহ ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। এটি সাধারণত একটি বা দুটি তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলি বিশেষ শব্দ দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

বায়েন তালাক আবার দুই প্রকার: বায়েন-ই-সুগরা (ছোট বিচ্ছেদ) ও বায়েন-ই-কুবরা (বড় বিচ্ছেদ)। বায়েন-ই-সুগরা হল এমন তালাক যেখানে স্বামী নতুন নিকাহ ও মোহর সহ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন, যেমন একটি বা দুটি তালাকের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে, বায়েন-ই-কুবরা হল তিন তালাক দেওয়া, যার পরে স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করে, সেই বিবাহ স্বাভাবিকভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

হানাফি মাযহাবে তালাক-ই-তাফবিজ বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের ধারণাও আছে, যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করেন। এটি তিনভাবে হতে পারে: (১) 'নিজেকে তালাক দাও', (২) 'তোমার বিষয় তোমার হাতে', এবং (৩) 'তুমি বেছে নাও'। এই অধিকার স্ত্রী ত্বরিত ব্যবহার করতে পারেন (সেই মজলিসে থাকা অবস্থায়) এবং তা এক বা একাধিক তালাকের জন্য হতে পারে। তালাক-ই-তাফবিজ নারীর অধিকার সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচিত।

হানাফি ফিকহে তালাকে মুআল্লাক বা শর্তাধীন তালাকের ধারণাও রয়েছে, যেখানে স্বামী তালাককে কোনো নির্দিষ্ট শর্তের সাথে যুক্ত করেন। যখন সেই শর্ত পূরণ হয়, তখন তালাক কার্যকর হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, "যদি তুমি তোমার পিতার বাড়ি যাও, তবে তুমি তালাকপ্রাপ্ত"। এই ধারণা দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রচলিত।

উল্লেখ্য যে, হানাফি ফিকহ অনুসারে তালাকের জন্য সাক্ষী আবশ্যক নয়, যদিও তা উত্তম বলে বিবেচিত। এটি সাধারণত বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের বিপরীত। আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের মত দেশে আইনগতভাবে তালাক নিবন্ধন করা হয়, যা সাক্ষীর উপস্থিতি এবং লিখিত দলিল আবশ্যক করে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিম পারিবারিক আইনে হানাফি নীতিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। এসব দেশে তালাক নিবন্ধন আবশ্যক এবং সমিতি পদ্ধতির (আড়াই বছর সময়কাল) প্রচলন রয়েছে, যা বিবাহ বিচ্ছেদের আগে পুনর্মিলন প্রচেষ্টার সুযোগ দেয়।

২) খোলা: নারীর উদ্যোগে বিবাহ বিচ্ছেদ

মূল আরবি বক্তব্য:

الخلع جائز، وهو أن تكره المرأة زوجها فتفتدي نفسها منه ببدل. فإن كان الكره من قبلها، جاز له أن يأخذ منها مالا على الطلاق، ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن كان من قبله كره له أن يأخذ شيئا.

বাংলা অনুবাদ: "খোলা বৈধ, আর তা হল যে নারী তার স্বামীকে অপছন্দ করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেকে তার থেকে মুক্ত করে। যদি অপছন্দ নারীর পক্ষ থেকে হয়, তবে পুরুষের জন্য তালাকের বিনিময়ে তার থেকে সম্পদ নেওয়া বৈধ, তবে সে যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নেওয়া অপছন্দনীয়। আর যদি অপছন্দ পুরুষের পক্ষ থেকে হয়, তবে তার কিছু নেওয়া অপছন্দনীয়।" **উৎস:** আল-হিদায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৭

মূল আরবি বক্তব্য:

والخلع فسخ في قول أبي حنيفة، وعند صاحبيه طلاق بائن. فعلى قول أبي حنيفة لا ينقص به عدد الطلاق، وعلى قولهما ينقص. وعلى قول الكل يجب المال المسمى في الخلع.

বাংলা অনুবাদ: "খোলা ইমাম আবু হানিফার মতে ফেসখ (বাতিলকরণ), আর তাঁর দুই সাথীর (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) মতে বায়েন তালাক। আবু হানিফার মতে এতে তালাকের সংখ্যা কমে না, আর তাঁদের (সাথীদের) মতে কমে। সকলের মতেই খোলায় উল্লিখিত সম্পদ ওয়াজিব হয়।" **উৎস:** মুখতাসার আল-কুদূরী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২

মূল আরবি বক্তব্য:

إذا أبى الزوج الطلاق، وطلبت المرأة الخلع وبذلت له عوضا، وثبت أن لا سبيل إلى إقامة حدود الله مع بقاء النكاح، يأمر الحاكم الزوج بقبول العوض وخلعها فإن امتنع طلقها عليه القاضي.

বাংলা অনুবাদ: "যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করে এবং স্ত্রী খোলা চেয়ে তাকে বিনিময় প্রদান করে, এবং প্রমাণিত হয় যে বিবাহ টিকিয়ে রাখার সাথে আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করার কোনো উপায় নেই, তবে বিচারক স্বামীকে বিনিময় গ্রহণ করে তাকে খোলা দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। যদি সে অস্বীকার করে, তবে কাজি তার পক্ষ থেকে তালাক দেবেন।" **উৎস:** রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪৭

ব্যাখ্যা: হানাফি মাযহাবে খোলা নারীর উদ্যোগে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এটি সেই পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয় যখন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখতে অনিচ্ছুক এবং তার কাছ থেকে মুক্তি চায়। খোলার ভিত্তি কুরআনের সূরা বাকারাহর ২২৯ আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে যে যদি দম্পতি আল্লাহর বিধান পালন করতে না পারে, তবে স্ত্রী বিনিময় দিয়ে মুক্তি পেতে পারে।

হানাফি ফিকহে খোলা হল এমন একটি চুক্তি যেখানে স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থনৈতিক বিনিময় (সাধারণত মোহর বা তার অংশ) প্রদান করে তার কাছ থেকে মুক্তি পায়। এটি উভয়পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হয়, তবে যদি স্বামী অযৌক্তিকভাবে খোলা দিতে অস্বীকার করে, তবে কাজি বা ইসলামী আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

খোলার প্রকৃতি সম্পর্কে হানাফি মাযহাবের ভিতরেই মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে খোলা 'ফেসখ' বা বিবাহ চুক্তির বাতিলকরণ, যা তালাক থেকে ভিন্ন। এই মতানুসারে,

খোলা তালাকের সংখ্যা কমায় না, অর্থাৎ এর পরেও তিনটি তালাকের পূর্ণ অধিকার স্বামীর থাকে। অন্যদিকে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (ইমাম আবু হানিফার দুই প্রধান ছাত্র) এর মতে খোলা 'বায়েন তালাক' (চূড়ান্ত তালাক), যা তালাকের সংখ্যা থেকে একটি কমায়। হানাফি মাযহাবে স্বামীর খোলার বিনিময়ে নেওয়া অর্থের পরিমাণ নিয়েও নির্দেশনা রয়েছে। যদি বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছা স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্বামী মোহরের সমান বা কম পরিমাণ নিতে পারে। কিন্তু যদি অপছন্দ বা বিরক্তি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে তার কিছুই নেওয়া উচিত নয়। এটি নারীর প্রতি ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়।

হানাফি ফিকহ অনুসারে, খোলার জন্য আবশ্যক শর্তাবলী হল: (১) স্ত্রীর প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন হওয়া, (২) স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার থাকা, (৩) স্ত্রী কর্তৃক বিনিময় প্রদান, এবং (৪) সুস্পষ্ট শব্দে খোলার ইচ্ছা প্রকাশ। খোলার ফলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে, তবে এটি তালাকের ইদ্দতের মতই (সাধারণত তিন মাসিক চক্র)।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে, যেমন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে, খোলার বিধান পারিবারিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে, নারী আদালতের মাধ্যমে খোলা চাইতে পারেন যদি তারা মোহর ফেরত দিতে রাজি থাকেন। আদালত প্রথমে মিলনের চেষ্টা করে, এবং যদি তা ব্যর্থ হয়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যেমন মিসর, জর্দান ও মরক্কোতে, খোলার প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা হয়েছে। ২০০০ সালে মিসরে 'খোলা আইন' পাস হয়, যা নারীকে আদালতের মাধ্যমে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই খোলা পাওয়ার অধিকার দেয়, যদি তিনি মোহর ফেরত দিতে রাজি থাকেন। এই আইনি সংস্কার হানাফি ফিকহের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা নারীর মুক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।খোলার ক্ষেত্রে জোর করার যোগ্য বিষয় হল যে, হানাফি মাযহাব নারীকে অসুখী বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। এটি ইসলামে নারীর অধিকার সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়

ইসলামী আইনের হানাফি মাজহাবে নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়গুলি নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

৫.৩ সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকার

১.নিজস্ব সম্পত্তি রাখা ও পরিচালনার অধিকার:

ইসলামী আইনে, বিশেষত হানাফি মাজহাবে, নারীদের সম্পত্তি রাখা ও পরিচালনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে:

- **সম্পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা**: একজন নারী তার নিজের সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে নিজের মালিকানায় রাখতে পারেন। বিবাহের পরেও তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে তার সম্পত্তি পৃথক থাকে।

- **সম্পত্তি অর্জনের উপায়সমূহ:** নারীরা বিভিন্ন উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন যেমন:
  - মোহর (বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ)
  - উপহার
  - উত্তরাধিকার
  - চাকরি বা ব্যবসা থেকে আয়
  - বিনিয়োগ থেকে আয়

- **সম্পত্তি পরিচালনার স্বাধীনতা:** হানাফি মাজহাবে নারীরা তাদের সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার, বিনিয়োগ, দান বা বিক্রয় করতে পারেন। এজন্য তাদের স্বামী, পিতা বা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন হয় না।
- **আর্থিক চুক্তি করার অধিকার:** হানাফি মতে, সাবালিকা নারীরা স্বাধীনভাবে আর্থিক চুক্তি করতে পারেন, ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন এবং কোনো বাধা ছাড়াই আর্থিক লেনদেন করতে পারেন।

২.উত্তরাধিকারের শরীয়াহ বিধান :

ইসলামে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলি কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হানাফি মাজহাবে নারীদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান:

- **মেয়ে হিসেবে উত্তরাধিকার:** যদি মৃত ব্যক্তির একজন মেয়ে থাকে, তবে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। যদি দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে, তবে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, যা তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।
- **স্ত্রী হিসেবে উত্তরাধিকার:** স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবেন যদি সন্তান থাকে, এবং এক-চতুর্থাংশ পাবেন যদি সন্তান না থাকে।
- **মা হিসেবে উত্তরাধিকার:** মা তার সন্তানের সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন যদি সন্তানের নিজের সন্তান থাকে, এবং এক-তৃতীয়াংশ পাবেন যদি সন্তানের নিজের সন্তান না থাকে (কিছু শর্ত সাপেক্ষে)।
- **বোন হিসেবে উত্তরাধিকার:** পূর্ণ বোন বা বাপের দিক থেকে বোন উত্তরাধিকার পাবেন যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পিতা না থাকে। একজন বোন থাকলে তিনি সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন, দুই বা ততোধিক বোন থাকলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবেন।
- **নানী/দাদী হিসেবে উত্তরাধিকার:** হানাফি মাজহাবে নানী/দাদী কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

৩.উত্তরাধিকারের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা

ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের অংশের পার্থক্য রয়েছে, যার যৌক্তিকতা হানাফি ফিকহে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়:

- **আর্থিক দায়িত্বের পার্থক্য:** ইসলামী আইন অনুযায়ী, পুরুষদের উপর পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব বেশি। পুরুষকে স্ত্রী, সন্তান এবং অন্যান্য নির্ভরশীল আত্মীয়দের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয়।
- **মোহর প্রদানের বাধ্যবাধকতা:** বিবাহের সময় পুরুষকে নারীকে মোহর দিতে হয়, যা নারীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- **সমন্বিত ব্যবস্থা:** উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সমন্বিত করে দেখতে হবে। ইসলামী পারিবারিক আইনে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা বিভিন্ন উপায়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **প্রাপ্তির নিশ্চয়তা:** নারীরা যে অংশ পান তা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে থাকে, যেখানে পুরুষদের প্রাপ্ত অংশ থেকে পরিবারের ব্যয় বহন করতে হয়।
- **ক্ষেত্রবিশেষে সমান বা বেশি প্রাপ্তি:** কিছু ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমান বা এমনকি বেশি অংশও পেতে পারেন, যেমন মা-বাবা উভয়ে জীবিত থাকলে সন্তানের সম্পত্তি থেকে মা ও বাবা উভয়েই সমান (এক-ষষ্ঠাংশ) পান।

হানাফি মাজহাব সহ ইসলামী আইনে নারীর সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকার একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার অংশ, যেখানে নারী ও পুরুষের পরিপূরক দায়িত্ব ও অধিকারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের সুষম ও ন্যায্য বিন্যাস রচনা করা হয়েছে।

৫.৪ সাক্ষ্য ও বিচার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

১. সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান :

ইসলামী ফিকহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাক্ষ্য (শাহাদাহ) সম্পর্কিত বিধান। হানাফি মাযহাবে নারীর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ বিধান রয়েছে, যা অন্যান্য মাযহাবের সাথে কিছুটা ভিন্নতা রাখে। নিম্নে হানাফি ফিকহ গ্রন্থসমূহ থেকে নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানগুলো তুলে ধরা হল:

মূল আরবি:

وشهادة النساء مع الرجال مقبولة في الأموال وما يؤول إليها من الحقوق... وشهادة النساء منفردات مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرتق والبكارة وعيوب النساء تحت الثياب.

বাংলা অনুবাদ: "পুরুষদের সাথে নারীদের সাক্ষ্য সম্পদ এবং সম্পদ সম্পর্কিত অধিকারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য... এবং শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য সেসব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য যেখানে পুরুষদের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেমন প্রসব, যৌন ছিদ্রের অবস্থা, কুমারীত্ব এবং কাপড়ের নিচে নারীদের শারীরিক সমস্যা সমূহ।" **উৎস:** আল-হিদায়া, মারগিনানি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৪

মূল আরবি:

وأما جنس الشاهد فإن كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا بد من شاهدين أو شاهد وامرأتين، وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة والبكارة ونحوهما فشهادة النساء وحدهن مقبولة.

বাংলা অনুবাদ: "সাক্ষীর প্রকার সম্পর্কে, যদি সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু এমন হয় যা সাধারণত পুরুষরা অবলোকন করতে পারে, তবে দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষীর প্রয়োজন। আর যদি এমন বিষয় হয় যা সাধারণত পুরুষরা অবলোকন করতে পারে না, যেমন প্রসব, কুমারীত্ব ইত্যাদি, তাহলে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।" **উৎস:** বাদায়েউস সানায়ে, কাসানি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৭৪

মূল আরবি:

شهادة النساء مع الرجال تقبل في الاموال وغيرها، ولكن لا تقبل في الحدود والقصاص... وتقبل شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال عادة... وجعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى شهادة امرأتين مع رجل بمنزلة شهادة رجلين في الأموال والمعاملات.

বাংলা অনুবাদ: "পুরুষদের সাথে নারীদের সাক্ষ্য সম্পদ এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু হাদ্দ এবং কিসাসের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য নয়... সাধারণত পুরুষরা যেসব বিষয়ে অবলোকন করতে পারে না সেসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য... ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পদ ও লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে একজন পুরুষের সাথে দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য বলে গণ্য করেছেন।" **উৎস:** আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৫০

মূল আরবি:

قال محمد: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادتهن مع الرجال في النكاح والطلاق والرجعة والمال... وتجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

বাংলা অনুবাদ: "মুহাম্মদ বলেন: আমি আবু হানিফা (রহ.) কে নারীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন: পুরুষদের সাথে নারীদের সাক্ষ্য বিবাহ, তালাক, রজ'আ (প্রত্যাবর্তন) এবং সম্পদ বিষয়ে বৈধ... এবং যেসব বিষয়ে পুরুষরা দেখতে সক্ষম নয় সেসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য বৈধ।" **উৎস:** কিতাবুল আসল, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪২

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

হানাফি মাযহাবে নারীদের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে মূল বিভাজন নিম্নরূপ:

১. পুরুষদের সাথে মিলিত সাক্ষ্য: সম্পদ, লেনদেন, বিবাহ, তালাক, ইজারা (ভাড়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাথে গ্রহণযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব একজন

পুরুষের সাক্ষ্যের বিপরীতে দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে সমান বলে গণ্য করে। অর্থাৎ দুজন পুরুষ সাক্ষীর পরিবর্তে একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী হতে পারেন।

২. **স্বতন্ত্র সাক্ষ্য:** যেসব বিষয়ে সাধারণত পুরুষরা অবলোকন করতে পারে না বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন: প্রসব, কুমারীত্ব, স্তন্যদান, নারীদের গোপন শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি।

৩. **অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র:** হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) এবং কিসাস (প্রতিশোধ) সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

হানাফি ফিকহবিদগণ এই বিভাজনের পেছনে কিয়াস (আইনগত যুক্তি) প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে, এটি নারীদের সক্ষমতা বা মর্যাদার প্রশ্ন নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতা এবং নারী-পুরুষের ভূমিকার বিভাজন থেকে উদ্ভূত। তাঁদের যুক্তি:

১. হানাফি মাযহাব মনে করে যে, নারীরা সাধারণত আর্থিক লেনদেন, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক বিষয়ে কম সম্পৃক্ত থাকায় এসব ক্ষেত্রে তাদের স্মৃতিশক্তি ও অভিজ্ঞতা কম হতে পারে। এ কারণে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান ধরা হয়েছে যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন।

২. নারীদের বিশেষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে (যেমন প্রসব, স্তন্যদান) শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে হানাফি মাযহাব নারীদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৩. হাদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যের অনুমোদন না দেওয়ার পেছনে যুক্তি হল, এসব গুরুতর অপরাধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা, কারণ এতে দোষীকে শাস্তি দেয়া হয় এবং একবার শাস্তি কার্যকর হয়ে গেলে তা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই।

৪. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, পুরুষদের সাথে মিলিত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারীদের আর্থিক বিষয়ে সাক্ষ্য অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে বিবাহ ও তালাকে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু হানাফি মাযহাবে গ্রহণযোগ্য।

বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ দেখা যায় যে, প্রাচীন ইসলামী সমাজে নারীরা বিভিন্ন আদালতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হতেন। বিশেষ করে সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারিবারিক বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বাজারে লেনদেন, বিবাহ অনুষ্ঠান, সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা সাক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্য, প্রসব ও অন্যান্য নারী-সম্পর্কিত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হত।

তুলনামূলকভাবে, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে সাধারণত বিবাহ, তালাক ও অনুরূপ পারিবারিক বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু হানাফি মাযহাব এসব ক্ষেত্রেও নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়ে অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে।

২. বিচারক হিসেবে নারীর ভূমিকা

মূল আরবি:

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ فَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُقَلَّدُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا تُوَلِّي الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ. وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ، وَالنِّسَاءُ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَات".ِ

অনুবাদ: "ইমাম কাসানী বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে বলেছেন: "বিচারক নিয়োগের বৈধতার শর্তসমূহের মধ্যে একটি হল: নিযুক্ত ব্যক্তি যেন বিচারিক ক্ষমতা লাভের যোগ্য হয়। আর নারী বিচারিক ক্ষমতা লাভের যোগ্য নয়, কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন: 'নারীকে বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগ করো না।' কারণ বিচারকতা হল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রকার, আর নারীরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের যোগ্য নয়।" **গ্রন্থ:** বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩

মূল আরবি:

قال في الهداية: "وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْقَضَاءِ عَلَى كَمَالِ الرَّأْيِ وَتَمَامِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَهُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام".ُ

অনুবাদ: "হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে: "ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে নারীর বিচারক হওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়; কারণ বিচারকতা প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ বিবেচনাবোধ, সম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক উপলব্ধির উপর, আর নারীরা বুদ্ধি ও ধর্মীয় দিক থেকে অপূর্ণাঙ্গ, যেমনটি সত্যবাদী (মুহাম্মাদ সা.) জানিয়েছেন।" **গ্রন্থ:** আল-হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬

মূল আরবি:

وفي الفتاوى الهندية: "وَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَتْ تَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ فِي الشَّيْءِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَحَافِلِ وَمَجَالِسِ الرِّجَالِ، وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، فَتَمْتَنِعُ تَوْلِيَتُهَا لِذَلِك".َ

অনুবাদ: "আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে: "নারীকে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া বৈধ নয়, যদিও সে কোন কোন বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে যোগ্য হতে পারে; কারণ তাকে সভা-সমাবেশ ও পুরুষের মজলিসে যাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে, আর বিচারালয়ে পুরুষেরা উপস্থিত থাকে, তাই এ কারণে তাকে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া অনুমোদিত নয়।" **গ্রন্থ:** আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮

ব্যাখ্যা:

হানাফি মাযহাবে নারীর বিচারক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিচারকতা হল একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব (ওলায়াত আম্মাহ) যা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু আইনগত জ্ঞান নয়, বরং সামাজিক নেতৃত্ব, স্থিরতা এবং দূরদর্শিতার সাথে সম্পর্কিত।

হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিতে বিচারকতা হল একটি "ওলায়াত" বা কর্তৃত্বমূলক পদ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত অনুযায়ী নারীদের জন্য এই ধরনের কর্তৃত্বমূলক পদ উপযুক্ত নয়। তাঁর যুক্তি ছিল:

১. হাদিসভিত্তিক যুক্তি: "লা তুওয়াল্লি আল-মারআতু আল-কাদা" (নারীকে বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগ করো না) - এই হাদিসটি হানাফি ফুকাহাদের কাছে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

২. সমাজব্যবস্থাভিত্তিক যুক্তি: বিচারালয়ে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা হতে পারে, যা ইসলামী পর্দা ব্যবস্থার পরিপন্থী।

৩. ফিতরাতি যুক্তি: বিচারকতা দূরদর্শিতা, মানসিক দৃঢ়তা ও স্থিরতা দাবি করে, যা হানাফি ফুকাহাদের মতে, আবেগপ্রবণ নারীদের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৪. সম্পূর্ণ ওলায়াত (কর্তৃত্ব) দাবি করে এমন পদে নারীদের নিযুক্তি না দেওয়ার রাসূল (সা.) এর নীতি।

সমাজের বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায় যে, প্রাচীন ইসলামী সমাজে এবং পরবর্তী হানাফি রাষ্ট্রগুলোতে নারীরা বিচারকের পদে নিযুক্ত হননি। অবশ্য, আবু হানিফার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের এক বর্ণনা অনুযায়ী, নারীরা সম্পত্তি ও নাগরিক বিষয়ক মামলায় বিচারক হতে পারেন বলে একটি মত প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এটি হানাফি মাযহাবের প্রধান মত নয়।

কিয়াস পদ্ধতি অনুসরণ করে, হানাফি ফুকাহাগণ বিচারকতা ও সাক্ষ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। যেহেতু শরীয়াহ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (যেমন হদ ও কিসাস), তাই তারা বিচারক হতে পারেন না, কারণ বিচারক সেই সব ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত দিতে হয়।

হানাফি মাযহাবের এই অবস্থানকে তুলনা করলে দেখা যায়, ইমাম তাবারি ও ইবনে জারির এর মত কিছু অন্য ফকিহ মতামত দিয়েছেন যে নারী যেসব ক্ষেত্রে সাক্ষী হতে পারেন, সেসব ক্ষেত্রে বিচারকও হতে পারেন। তবে হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিতে বিচারকতার প্রশ্নটি শুধু সাক্ষ্যের যোগ্যতার সাথে নয়, বরং সামগ্রিক ওলায়াত বা কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

৩. বিচারপ্রার্থী হিসেবে নারীর অধিকার

মূল আরবি:

قال السرخسي في المبسوط: "وَالْمَرْأَةُ فِي الْخُصُومَةِ كَالرَّجُلِ، فَلَهَا أَنْ تُخَاصِمَ بِنَفْسِهَا فِي جَمِيعِ حُقُوقِهَا وَأَنْ تُوَكِّلَ مَنْ شَاءَتْ لِيُخَاصِمَ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهَا وَمِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ".

অনুবাদ: "ইমাম সারাখসী আল-মাবসূত গ্রন্থে বলেছেন: "মোকদ্দমা বা বিবাদে নারী পুরুষের অনুরূপ। তার সকল অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে নিজে মোকদ্দমা করার অধিকার রয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে মোকদ্দমা করার জন্য যাকে ইচ্ছা উকিল নিযুক্ত করার অধিকারও রয়েছে, কারণ সে তার নিজের অধিকারসমূহে তাসাররুফ (হস্তক্ষেপ) করার এবং উকিল নিযুক্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন।" **গ্রন্থ:** আল-মাবসূত, ১৬তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২

মূল আরবি:

وفي الفتاوى الهندية: "تُسْمَعُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْحُجَّةِ فَرْضٌ عَلَيْهَا فِي حَقِّهَا، فَلَا يَمْنَعُهَا عَدَمُ الْمَحْرَمِ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُبِيحُ لَهَا الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا".

অনুবাদ: "আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে: "নারীর দাবি শোনা হবে যদিও তার সাথে কোনো মাহরাম না থাকে; কারণ তার অধিকার সম্পর্কিত প্রমাণ উপস্থাপন করা তার জন্য ফরয, তাই মাহরামের অনুপস্থিতি তাকে বাধা দিতে পারে না, কারণ প্রয়োজনীয়তা তাকে তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়।" **গ্রন্থ:** আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩

মূল আরবি:

قال ابن عابدين في رد المحتار: "وَلَا فَرْقَ فِي سَمَاعِ الدَعْوَى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً، إِذَا كَانَ لَهَا خُصُومَةٌ وَحَقٌّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي سَمَاعُ دَعْوَاهَا وَفَصْلُ خُصُومَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا بِحُجَّةِ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، أَوْ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا".

অনুবাদ: "ইবনে আবেদীন রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেছেন: "মামলা শোনার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যদিও সে তরুণী হয়, যদি তার কোনো বিবাদ বা অধিকার থাকে, তাহলে কাজির জন্য তার দাবি শোনা এবং তার বিবাদের ফয়সালা করা আবশ্যক, এবং তাকে এই যুক্তিতে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ নয় যে সে একজন নারী, অথবা সে তার বাড়ি থেকে বের হয় না।" **গ্রন্থ:** রাদ্দুল মুহতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১

মূল আরবি:

وفي أصل الشيباني: "وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَّعِيَ حُقُوقَهَا بِنَفْسِهَا أَمَامَ الْقَاضِي، وَأَنْ تُوَكِّلَ مَنْ شَاءَتْ لِلدَّعْوَى نِيَابَةً عَنْهَا، وَلَا تَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى إِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا، لِأَنَّهَا كَامِلَةُ الْأَهْلِيَّةِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ".

অনুবাদ: "আল-আসল গ্রন্থে ইমাম শায়বানী বলেছেন: "নারীর অধিকার রয়েছে বিচারকের সামনে নিজে তার অধিকারসমূহ দাবি করার, এবং তার পক্ষ থেকে দাবি উপস্থাপনের জন্য যাকে ইচ্ছা উকিল নিযুক্ত করার, এবং এজন্য তার স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ শরীয়াহসম্মত তাসাররুফে (কার্যসম্পাদনে) সে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন।" **গ্রন্থ:** কিতাবুল আসল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬

ব্যাখ্যা:

হানাফি মাযহাবে বিচারপ্রার্থী হিসেবে নারীর অধিকার বিষয়ে স্পষ্ট ও অকাট্য দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে। এই মাযহাব অনুযায়ী, নারী তার সকল অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচারালয়ে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং এতে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি।

হানাফি ফিকহের মূলনীতি হল, নারী পুরুষের মতোই আইনগত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ "আহলিয়াত" বা সক্ষমতা রাখে। এই নীতির ভিত্তিতে, হানাফি মাযহাবে নারীর বিচারপ্রার্থী হিসেবে অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

১. নিজের অধিকার রক্ষার জন্য স্বাধীনভাবে আদালতে দাবি উপস্থাপন করতে পারে: হানাফি মাযহাবে নারী নিজ অধিকার রক্ষার্থে আদালতে দাবি উপস্থাপন করতে পারে, এবং এক্ষেত্রে তার স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এটি তার আইনগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

২. আইনি প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার: নারী তার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য স্বাধীনভাবে উকিল (আইনি প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে পারে। এর মাধ্যমে হানাফি ফিকহ্ নারীর আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৩. পর্দার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকার: হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, নারীকে পর্দা পালন করতে হয়। কিন্তু তার অধিকার রক্ষার্থে আদালতে যাওয়াকে "যরূরাত" বা আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারেন।

৪. মাহরাম ছাড়াই আদালতে যাওয়ার অধিকার: অধিকার রক্ষার তাগিদে, নারী তার সাথে কোনো মাহরাম না থাকলেও আদালতে যেতে পারেন এবং তার দাবি শোনা কাজির উপর আবশ্যক।

বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে আদালতে দাবি উপস্থাপন করেছেন। হানাফি মাযহাব অনুসরণকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রে, উসমানী খিলাফতসহ, নারীরা তাদের সম্পত্তি, বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে আদালতে দাবি উপস্থাপন করেছেন।

হানাফি ফিকহের কিয়াস পদ্ধতি অনুসরণ করে, ফুকাহাগণ নারীর আইনগত সক্ষমতাকে (আহলিয়াত) বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকারের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন। যেহেতু নারী নিজ সম্পদ পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, তাই সে নিজ অধিকার রক্ষায় বিচারপ্রার্থী হতে পারে।

অধ্যায় ৬ : ইসলামি ইতিহাসে নারীর অবদান ও অর্জন

৬.১ নবীর যুগে বিশিষ্ট নারী সাহাবীগণ

খাদিজা (রা.) এর জীবন ও অবদান

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলিম এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। তাঁর জীবন ও অবদান মুসলিম নারীদের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ।

খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবারের কন্যা, যিনি নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইবনে হিশামের সীরাতুন নবী গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা

১৯১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পুরুষদের নিয়োগ করতেন, যা তৎকালীন আরব সমাজে নারীদের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
সহীহ বুখারী (খণ্ড ৪, হাদিস নং ৩৮১৬) অনুসারে, যখন নবী মুহাম্মদ (সা.) হেরা গুহা থেকে প্রথম ওহী নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলেন, তখন খাদিজা (রা.)-ই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না, কারণ আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন, অভাবীদের দান করেন এবং মেহমানদের সেবা করেন।"
ইবনে সা'দের আল-তাবাকাত আল-কুবরা গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪) বর্ণিত আছে যে, খাদিজা (রা.) শুধু মানসিক সমর্থনই দেননি, বরং তাঁর সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েও ইসলামের প্রাথমিক প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি নিজের সম্পদ ইসলাম প্রচার ও দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্যে ব্যয় করেছিলেন।
আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদে (খণ্ড ৬, হাদিস নং ২৪৮৭৩) বর্ণিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতী নারী চারজন: মারিয়াম (আ.), আসিয়া, খাদিজা এবং ফাতিমা।" এটি খাদিজা (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করে।
খাদিজা (রা.) ছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে একজন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি, যার পরামর্শ ও সমর্থন তাঁকে কঠিন সময়ে শক্তি জুগিয়েছে। সহীহ মুসলিমে (খণ্ড ৪, হাদিস নং ২৪৩৫) বর্ণিত আছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) খাদিজা (রা.)-কে এতই সম্মান করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

2.আয়েশা (রা.) এর শিক্ষা ও হাদিস বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী শিক্ষাবিদ ও হাদিস বর্ণনাকারীদের একজন, যার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইসলামি শরীয়তের বিকাশে অপরিসীম অবদান রেখেছে।
ইবনে হাজার আল-আসকালানির আল-ইসাবা ফি তামযিজিস সাহাবা গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়েশা (রা.) নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। **তিনি প্রায় ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা তাঁকে অন্যতম প্রধান হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।**
আল-জামি আল-বায়ান অল-ইলম গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮) বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রা.) শুধু হাদিস বর্ণনাই করেননি, বরং হাদিসের ব্যাখ্যা, ফিকহ (ইসলামী আইন) এবং কুরআনের তাফসিরেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাছে পুরুষ ও নারী উভয়ই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন।
সহীহ বুখারী (খণ্ড ৫, হাদিস নং ৩১০১) অনুসারে, উরওয়া ইবনে জুবায়ের বলেছেন: "আমি কখনো এমন কাউকে দেখিনি যিনি কুরআন, হালাল-হারাম, আরবী কবিতা ও বংশপরম্পরা সম্পর্কে আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন।"

আয়েশা (রা.) নারী বিষয়ক ফতোয়া প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আল-মুসতাদরাক আলা আল-সহীহাইন গ্রন্থে (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১) বর্ণিত আছে যে, তিনি নারীদের হায়েয, নিফাস, গোসল ও অন্যান্য বিষয়ে অসংখ্য ফতোয়া দিয়েছিলেন, যা অন্য সাহাবীদের জানা ছিল না।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেছেন: "যদি সমস্ত মানুষের জ্ঞান আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানই বেশি হবে" (আল-তাবাকাত আল-কুবরা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫)।

আয়েশা (রা.) ছিলেন নারী শিক্ষার জীবন্ত উদাহরণ, যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন শুধু পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং নারীরাও জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

3.ফাতিমা (রা.) এর আদর্শ

হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.) ছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা এবং হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী, যিনি মুসলিম নারীদের জন্য সাহস, ত্যাগ ও ধৈর্যের এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে পরিচিত।

সহীহ বুখারী (খণ্ড ৫, হাদিস নং ৩৭১৪) অনুসারে, **নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "ফাতিমা আমার শরীরের অংশ, যে তাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।"** এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ফাতিমা (রা.) নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে কতটা প্রিয় ছিলেন।

আল-তিরমিযির সুনানে (খণ্ড ৫, হাদিস নং ৩৮৭৪) বর্ণিত আছে যে, **নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীরা চারজন: খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম (ফিরাউনের স্ত্রী)।"**

ফাতিমা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধর্মপরায়ণ ও দানশীল। আল-মুসতাদরাক আলা আল-সহীহাইন গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৩) বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের সাহায্য করতেন। একবার একজন ভিক্ষুক তাঁর দ্বারে এলে, তিনি নিজের কাছে থাকা একমাত্র খাবার তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবনে সা'দের আল-তাবাকাত আল-কুবরা গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাতিমা (রা.) সাংসারিক কাজকর্ম নিজেই করতেন, আমির বুহারী চরকা চালিয়ে সুতা কাটতেন এবং জাঁতা ঘুরিয়ে ময়দা পিষতেন, যাতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যেত। এতে তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন ও কর্মঠতার প্রমাণ মেলে।

ফাতিমা (রা.) ছিলেন এমন এক নারী, যিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইসলামের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফ গ্রন্থে (খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৫৩) বর্ণিত আছে যে, তিনি নারীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচার করতেন এবং তাদের নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কে শিখাতেন।

ফাতিমা (রা.)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একজন নারী একই সাথে একজন আদর্শ মা, স্ত্রী, শিক্ষক ও সমাজসেবক হতে পারেন। তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন, ত্যাগ ও সেবা মুসলিম নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

4.উম্মে সালামা (রা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন **নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী, যিনি তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।**

সহীহ বুখারীতে (খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৭৩১) বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন মুসলমানরা হতাশা ও ক্ষোভে ভুগছিলেন, তখন উম্মে সালামা (রা.) নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন নিজেই প্রথমে কুরবানি করেন ও মাথা মুন্ডন করেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে, সাহাবীরাও তা অনুসরণ করেছিলেন। এভাবে উম্মে সালামা (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ একটি জটিল পরিস্থিতি সমাধানে সাহায্য করেছিল। আল-ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব গ্রন্থে (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯৮৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী। তিনি অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে পরামর্শ দিতেন, যা প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

আল-তাবরানির আল-মুজাম আল-কাবীর গ্রন্থে (খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৩০৬) বর্ণিত আছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর উম্মে সালামা (রা.) সাহাবীদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। **তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এতই গভীর ছিল যে, খলিফারাও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।**

উম্মে সালামা (রা.) কারবালার ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। সুনান আল-তিরমিযীতে (খণ্ড ৫, হাদিস নং ৩৭৭৫) বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাথায় ধুলা লেগে আছে, এবং তিনি বলেছিলেন যে, তিনি হুসাইন (রা.)-এর হত্যার দৃশ্য দেখেছেন। এটি তাঁর আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার প্রমাণ।

উম্মে সালামা (রা.) ইসলামের প্রচার ও রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইবনে সা'দের আল-তাবাকাত আল-কুবরা গ্রন্থে (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৮৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, **তিনি ৩৭৮টি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাতেই নয়, ধর্মীয় জ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন**।

উম্মে সালামা (রা.)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ইসলামে নারীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও সাহস মুসলিম নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

৬.২ খিলাফতের যুগে নারীর অবস্থান

ইসলামি খিলাফতের বিভিন্ন যুগে নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এই অবদান নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১.প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (১১-৪০ হিজরি/৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)

খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন। তিনি মহিলাদের সম্পর্কিত বিষয়ে কেবল পরামর্শ দিতেন না, বরং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও পরামর্শ দিতেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৩১)

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) নিজ পিতা উমর (রা.) এর খিলাফতকালে নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কুরআন সংরক্ষণ ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ইবনে সা'দ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫)

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ আল-আদাবিয়্যাহ (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবিয়া যিনি উমর (রা.) এর খিলাফতকালে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায় বিচার বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মদিনার বাজারে হিসবা (বাজার নিয়ন্ত্রক) এর দায়িত্ব পালন করেন। (আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ইবনে আবদুল বার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৭১)

উম্মে শারিক (রা.) রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশাতেই একটি স্বাধীন সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন, যেখানে তিনি মহিলাদের যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতেন। তিনি খিলাফতের যুগেও এই কাজ অব্যাহত রাখেন। (আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, হাকিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৬)

খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.) খিলাফতের যুগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে সিরিয়ার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। (তারিখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক, আল-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭২)

আল-বাদিয়াহ (রা.) নামক সাহাবিয়া খিলাফতের যুগে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীদের বিচারক হিসেবে কাজ করার অধিকার রয়েছে। (আল-ফিকহ আল-ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ওয়াহবা আল-জুহায়লি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

সামারা বিনতে নাহীক (রা.) খিলাফতকালে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে একজন বিশেষায়িত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি হাট-বাজারে পরিদর্শন করতেন, সামাজিক অবনতি রোধে কঠোর ভূমিকা পালন করতেন। (তারিখ আল-মদিনা, ইবনে শাব্বাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ (রা.) খিলাফতের যুগে নারী শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। (সীরাত ইবন হিশাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১)

নাইলাহ বিনতে আল-ফারাফিসাহ, উসমান (রা.) এর স্ত্রী, খিলাফতের যুগে স্বামীর পাশে থেকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতেন। তিনি উসমান (রা.) কে হত্যা করার চেষ্টা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেও আহত হন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৮৮)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) খিলাফতের যুগে নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি পিতা আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে মহিলাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৫)

উমাইয়া খিলাফত (৪১-১৩২ হিজরি/৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

উমাইয়া যুগে নারীরা রাজ দরবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতেন। খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের স্ত্রী আতিকা বিনত যায়েদ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাবারি তাঁর "তারিখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক" (ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ৪২৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আতিকা বিভিন্ন রাজনীতিক সিদ্ধান্তে খলিফার পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন।

খায়যুরান, খলিফা আল-মাহদির স্ত্রী, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইবনে খাল্লিকান "ওয়াফায়াত আল-আয়ান" (ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ১২৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খায়যুরান খলিফা হারুন অর-রশীদের মায়ের জন্য তিনি আরও প্রভাবশালী হয়েছিলেন এবং রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁর পরামর্শক্রমে গৃহীত হত।

আব্বাসি খিলাফত (১৩২-৬৫৬ হিজরি/৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

আব্বাসি যুগে নারীরা আরও বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করেন। ঝুবাইদা, খলিফা হারুন অর-রশীদের স্ত্রী, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। আল-মাসুদি "মুরুজ আল-ধাহাব" (ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হজ্জযাত্রীদের জন্য মক্কা-মদিনায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন পূর্ত কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শাজার আদ-দুর মিশরে ৮০ দিন রাজত্ব করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন ইসলামি ইতিহাসে একমাত্র নারী শাসক যিনি নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। ইবনে তাগরি বিরদি "আন-নুজুম আয-যাহিরা" (ভলিউম ৭, পৃষ্ঠা ৪১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বামী সুলতান আস-সালেহ আইয়ুবের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

২.শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ভূমিকা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীরা ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রেখেছেন। এই বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) খিলাফতের যুগে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা ইসলামি জ্ঞানের একটি অমূল্য সম্পদ। তিনি অনেক উলামা ও ফকিহদের শিক্ষা দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি, ইমাম বুখারি, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮)

হাফসা বিনতে উমর (রা.) কুরআন সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার কাছে সংরক্ষিত মুসহাফ (কুরআনের কপি) পরবর্তীতে উসমান (রা.) কর্তৃক কুরআন সংকলনের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। (সহিহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৬৮)

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন কারী (কুরআন পাঠক), যিনি রাসূল (সা.) এর নির্দেশে নিজ এলাকার মহিলাদের নামাজে ইমামতি করতেন। তিনি খিলাফতের যুগেও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখেন। (সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩২)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) খিলাফতের যুগে অনেক শিক্ষার্থীদের হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বিশেষত মহিলাদের জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। (আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ইবনে সা'দ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৫০)

রুবাইয়িদ বিনতে মুআওয়িজ (রা.) খিলাফতের যুগে একজন বিখ্যাত হাদিস শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অনেক প্রখ্যাত বিদ্বান তার কাছ থেকে হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন। (সহিহ বুখারি, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৭১)

উম্মে আতিয়া আল-আনসারিয়া (রা.) খিলাফতের যুগে ফিকহ (ইসলামি আইন) এর বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিশেষত মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত ফিকহ বিষয়ে গবেষণা করতেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৫৯)

আল-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত শিক্ষিকা, যিনি খিলাফতের যুগে মহিলাদের পড়াশোনা এবং চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি উমর (রা.) এর খিলাফতকালে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। (আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ইবনে আবদুল বার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৭১)

উম্মে সুলাইম (রা.) খিলাফতের যুগে মদীনায় একটি মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। তিনি অনেক মহিলাদের কুরআন, হাদিস ও ইসলামি আইন শিক্ষা দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩০)

উম্মে হানি (রা.) খিলাফতের যুগে একজন বিশিষ্ট শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মক্কায় একটি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। (সুনান আন-নাসায়ী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৮)

সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা.), রাসূল (সা.) এর ফুফু, খিলাফতের যুগে কবিতা ও সাহিত্যে অবদান রাখেন। তিনি বিশেষ করে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২০৯)

উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া যুগে নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান অব্যাহত রাখেন। আমরা বিনতে আব্দুর রহমান একজন বিশিষ্ট হাদিস শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি আয়েশা (রা.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর থেকে হাদিস শিক্ষা নেন। ইমাম যাহাবি "সিয়ার আলাম আন-নুবালা" (ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ৫০৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উরওয়া ইবনে জুবাইর, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর প্রমুখ তাবেয়ী তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

উমাইয়া যুগে নারীরা কবিতা, সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রেও অবদান রাখেন। সুকাইনা বিনতে হুসাইন, হযরত হুসাইন (রা.) এর কন্যা, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইবনে আবদ রাব্বিহ "আল-ইকদ আল-ফারিদ" (ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ৩২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কবিতা ও সাহিত্য আলোচনার জন্য নিয়মিত সাহিত্য মজলিস আয়োজন করতেন।

আব্বাসি খিলাফত

আব্বাসি যুগে নারীদের শিক্ষাগত অবদান আরও বিকশিত হয়। এই সময়ে নারী শিক্ষিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা মাদরাসা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতেন। ফাতিমা বিনতে সামারকান্দি একজন বিশিষ্ট ফিকহবিদ ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান "ওয়াফায়াত আল-আয়ান" (ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ১৮২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ এবং তাঁর ফিকহী মতামত বহু ক্ষেত্রে গৃহীত হতো।

করিমা আল-মারওয়াজিয়া একজন বিখ্যাত হাদিস শিক্ষিকা ছিলেন। খতিব বাগদাদি "তারিখ বাগদাদ" (ভলিউম ১৪, পৃষ্ঠা ৪৪৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সহিহ বুখারি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা সহিহ বুখারি অধ্যয়নের জন্য আসতেন।

শাহদা আল-কাতিবা "ফখর আন-নিসা" (নারীকুলের গর্ব) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এক অতুলনীয় হাদিস শিক্ষিকা ছিলেন। ইমাম যাহাবি "সিয়ার আলাম আন-নুবালা" (ভলিউম ২০, পৃষ্ঠা ৫৪২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মজলিসে বিখ্যাত আলেম ও রাজ-রাজড়ারা উপস্থিত হতেন।

৩.অর্থনৈতিক অবদান

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

খিলাফতের যুগে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এ বিষয়টি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ও পরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তার ব্যবসায়িক মডেল খিলাফতের যুগে অনেক মহিলা ব্যবসায়ীদের অনুপ্রেরণা ছিল। (সীরাত ইবন হিশাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৯)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) খিলাফতের যুগে একজন সফল কৃষিবিদ ছিলেন। তিনি নিজে জমি ক্রয় করে কৃষিকাজ পরিচালনা করতেন। (আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ইবনে সা'দ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৫০)

উম্মে শারিক (রা.) ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী, যিনি নিজের সম্পদ ইসলামের সেবায় দান করেছেন। খিলাফতের যুগে তিনি অনেক অসহায় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা করতেন। (সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

জাইনাব বিনতে জাহশ (রা.) হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন এবং সেই অর্থ দান করতেন। খিলাফতের যুগে তিনি অনেক মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯০৭)

আল-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, যিনি খিলাফতের যুগে মদীনার বাজারে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি উমর (রা.) এর খিলাফতকালে বাজার নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বও পালন করেন। (আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ইবনে আবদুল বার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৭১)

আল-খানসা (রা.) ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী ও জমির মালিক। তিনি খিলাফতের যুগে নিজের সম্পদ ইসলামের সেবায় দান করেছেন। তিনি বিশেষত মহিলা উদ্যোক্তাদের সাহায্য করতেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৮৬)

উম্মে সুলাইম (রা.) ছিলেন একজন কৃষিবিদ ও ব্যবসায়ী। তিনি খিলাফতের যুগে নিজের খেজুর বাগান থেকে প্রচুর আয় করতেন এবং সেই অর্থ দান করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩০)

রাইতা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী, যিনি খিলাফতের যুগে কাপড় তৈরি করে বিক্রি করতেন। তিনি অনেক মহিলাদের এই শিল্প শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। (আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ইবনে সা'দ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩২৫)

হাওলা বিনতে তুওয়াইত (রা.) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, যিনি খিলাফতের যুগে সুগন্ধি তৈরি ও বিক্রি করতেন। তিনি মহিলাদের জন্য একটি ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। (আল-ইসাবাহ ফী তামীজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১০)

উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া যুগে নারীরা শিল্পকলা, বস্ত্রশিল্প, ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো বিভিন্ন শিল্পে অবদান রাখেন। নাফীসা, একজন কুরাইশি মহিলা, সাবান তৈরির ব্যবসায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জাহিয "আল-বায়ান ওয়াত-তাবাইয়্যুন" (ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ১৫২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর তৈরি সাবান বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।

বিনতে মুআওয়িয়া, খলিফা মুআওয়িয়ার কন্যা, বস্ত্রশিল্পে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আল-বালাধুরি "আনসাব আল-আশরাফ" (ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা ১৩০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দামেস্কে একটি বস্ত্রশিল্প কারখানা পরিচালনা করতেন, যেখানে অনেক মহিলা কর্মরত ছিলেন।

আব্বাসি খিলাফত

আব্বাসি যুগে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ও দানধ্যানের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঝুবাইদা, হারুন অর-রশীদের স্ত্রী, মক্কার পথে "আইন জুবাইদা" নামে একটি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিলেন, যা হাজারো বছর ধরে হজ্জযাত্রীদের উপকারে এসেছে। আল-তাবারি "তারিখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক" (ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ৩৪৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রকল্পের জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন।

খায়যুরান, খলিফা আল-মাহদির স্ত্রী, প্রথম মহিলা যিনি আব্বাসি খিলাফতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম যাহাবি "সিয়ার আলাম আন-নুবালা" (ভলিউম ৯, পৃষ্ঠা ২৭৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সম্পত্তি থেকে "মাদরাসা আল-খায়যুরান" নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আর-রাশিদিয়া, একজন আব্বাসি রাজকন্যা, বাগদাদে একটি বড় হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। ইবনে আবি উসাইবিয়া "উয়ুন আল-আনবা" (ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ২৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হাসপাতালে সেই সময়ের সেরা চিকিৎসকরা কাজ করতেন এবং সেখানে গরিব-দুঃখীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হতো।

খিলাফতের বিভিন্ন যুগে নারীরা প্রশাসনিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের এই অবদান প্রমাণ করে যে, ইসলামি ইতিহাসে নারীরা শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের এই অবদান ও অর্জন আজও মুসলিম নারীদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

অধ্যায় ৭: সমসাময়িক বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জ

৭.১ বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিতর্ক

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

বহুবিবাহ একটি কেবল ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজেই নয়, বরং প্রায় সকল প্রাচীন সমাজেই বিদ্যমান প্রথা ছিল। মিশরীয়, চীন, হিন্দু ও ইহুদি সমাজেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা স্বাভাবিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। ইসলাম-পূর্ব আরবে কেউ কেউ দশ বা তার অধিক স্ত্রী রাখত, এবং কোনো ধরনের সীমা বা নৈতিকতা অনুসরণ করা হতো না। সেই পটভূমিতে ইসলাম বহুবিবাহের প্রচলন একেবারে বিলোপ না করে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনে এবং কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করে।

ইসলামিক বিধানের সীমাবদ্ধতা ও শর্তাবলী:

ইসলামে বহুবিবাহ অনুমোদিত হলেও তা শর্তসাপেক্ষ এবং সীমিত। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"তোমরা তোমাদের পছন্দমতো নারীদের মধ্যে দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ করো; কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একজনই গ্রহণ করো।" **সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩**

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে:

- সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ন্যায়বিচার বা ইনসাফ (সমতা) বজায় রাখা আবশ্যক।
- ইনসাফে অক্ষমতার আশঙ্কা থাকলে একাধিক বিবাহ না করাই নির্দেশিত।

ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যায় অনেক মুফাসসির বলেন, স্ত্রীদের প্রতি সময়, ভরণ-পোষণ ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সমতা রাখতে হবে। তবে আবেগ-ভিত্তিক ভালোবাসায় সমতা রাখা কঠিন বলেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"তোমরা যতই চেষ্ট করো না কেন, নারীদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবে না। **সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৯**

এতে বোঝা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ কেবল বাহ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব, হৃদয়ের অনুভব বা ভালবাসার সমতায় নয়।

সুন্নাহতেও দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুবিবাহ করেছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সামাজিক দায়িত্ব, বিধবা নারীর পুনর্বাসন এবং রাজনৈতিক ও দাওয়াতী সম্পর্ক গঠনের উদ্দেশ্যে ছিল। সাধারণ মুসলিমদের জন্য এই নীতি অনুসরণে শর্তাবলী কঠোরভাবে বিবেচ্য।

চারটি সুপ্রসিদ্ধ মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বহুবিবাহ বৈধ হলেও তা শর্তসাপেক্ষ:

হানাফি মাজহাব:

হানাফি মাজহাবে বহুবিবাহ বৈধ হলেও তা ইনসাফের শর্তে সীমিত। কিতাব: *আল-হিদায়া,* খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫২। যদি ইনসাফ করা সম্ভব না হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ মাকরুহ হতে পারে।

মালিকি মাজহাব:

মালিকি ফিকহে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ সামাজিক অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। রেফারেন্স: *আল-মুদাওয়ানা,* খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৩।

শাফি মাজহাব:

শাফি মাজহাবেও ইনসাফকে কেন্দ্র করে বহুবিবাহকে মূল্যায়ন করা হয়। *কিতাবুল উম্ম,* খণ্ড ৫।

হানবালি মাজহাব:

হানবালি মাজহাবে ন্যায়বিচার না করতে পারার আশঙ্কা থাকলে বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত। *আল-মুগনি,* খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৮।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিষয়টির বিশ্লেষণ:

বর্তমান বিশ্বে বহুবিবাহ একটি বিতর্কিত ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে নারী-পুরুষ সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে। সমসাময়িক নারীবাদী ভাবধারা, পশ্চিমা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনেক মুসলিমপ্রধান দেশেই নারীর মর্যাদা বিষয়ে নতুন আইন ও বিধিবিধান গৃহীত হওয়ায় এই প্রথার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ নিম্নরূপ:

- **সামাজিক ও মানসিক চাপ:** অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ মানসিকভাবে প্রথম স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ন্যায়বিচারের অভাবে পারিবারিক অশান্তি ও সন্তানদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- **আর্থিক দিক:** একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, আবাসন ও সন্তানের দায়িত্ব পালনে অনেক পুরুষের সামর্থ্য থাকে না, ফলে শরিয়তের ন্যায়বিচার শর্ত লঙ্ঘিত হয়।

- **আইনগত দিক:** অনেক মুসলিমপ্রধান দেশেও (যেমন তুরস্ক, তিউনিসিয়া) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ও আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন।

- **নারীর সম্মান ও মর্যাদা:** অনেকে মনে করেন বহুবিবাহ নারীর মর্যাদার হানি ঘটায়, যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি দায়িত্বপূর্ণ আচরণ ও নারী পুনর্বাসনের একটি উপায় হতে পারে।

মূল কথা,ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি কেবল একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে এসেছে—যেমন: যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সমাজে বিধবা ও এতিমদের আশ্রয় দেওয়া, অনাথ সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বা বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে কামনাবাসনা পূরণ। ঠিক তেমনি ভাবে আবার যদি কোনো পরিস্থিতির কারণে সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীরা সংখ্যা আশঙ্কাজনক

হরে বৃদ্ধি পায় তাহলে সামাজিক সংকট নিরসনে শরিয়া অনুযায়ী ইনসাফের সাথে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে

এটি কখনোই পুরুষতান্ত্রিক সুযোগ বা নারী নিপীড়নের হাতিয়ার নয়।আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিধান অনুযায়ী শর্ত পূরণ ও ন্যায়বিচার না করতে পারলে এক স্ত্রীর সাথেই বিবাহিত জীবন যাপন করাই শরিয়তের পরামর্শ। ইসলামের মূলনীতি হলো ন্যায়, দয়া ও সামাজিক ভারসাম্য—যা বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৭.২: হিজাব ও পর্দা সম্পর্কিত আলোচনা

১. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

হিজাব ও পর্দা ইসলামে শুধু পোশাকগত নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক বিধান। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শালীনতা ও সামাজিক মর্যাদার এক অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য পর্দার আদেশ দিয়েছেন:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِن﴾

"আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, যা সাধারণত প্রকাশিত হয় তা ছাড়া, আর তারা যেন নিজেদের ওড়না দিয়ে বুক ঢেকে রাখে।" **সূরা আন-নূর, ২৪:৩১**

এই আয়াতে নারীদের উদ্দেশ্যে তিনটি মূল আদেশ দেওয়া হয়েছে—(১) দৃষ্টি সংযত রাখা, (২) লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা এবং (৩) সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। "خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِن" বাক্যাংশটি বোঝায় যে মাথার ওড়না (খিমার) বুক পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া উচিত।

অন্য একটি আয়াতে:

﴿يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর নামিয়ে দেয়। এটি তাদেরকে চেনার জন্য বেশি উপযোগী, ফলে তারা কষ্টার্জিত হবে না।" —**সূরা আহযাব, ৩৩:৫৯**

এখানে "جَلَابِيب" অর্থ বড় চাদর, যা পুরো শরীর ঢেকে দেয়। এটি নারীদের সম্মান রক্ষায় একটি সামাজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বটে।

হাদীসে সাহাবায়ে কেরাম পর্দার বাস্তব রূপ কীভাবে অনুসরণ করতেন, তার দৃষ্টান্ত আছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النِّسَاءُ يَنْصَرِفْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ

"আয়িশা (রা.) বলেন: মসজিদ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় নারীদের কেউ চিনতে পারত না, কারণ তারা পূর্ণরূপে আবৃত থাকত।" —সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৭০

২. সমসাময়িক পশ্চিমা সমালোচনার মূল্যায়ন

পশ্চিমা সমাজে হিজাবকে প্রায়শই **নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতীক** হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেকেই মনে করেন এটি নারীদের দমন করার উপায়। কিন্তু এ ধরনের সমালোচনায় মূলত তিনটি সমস্যা আছে:

ধারণাগত ভুল: হিজাবকে জোরপূর্বক আরোপিত পোশাক বলে ধরা হয়, যদিও বহু মুসলিম নারী এটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে নিজেদের আত্মপরিচয় ও ধর্মীয় অভিব্যক্তি খুঁজে পান।

উপনিবেশবাদী মানসিকতা: হিজাববিরোধী অবস্থান অনেক সময় পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রতিফলন। এটি সেই একই মানসিকতা, যা উপনিবেশ যুগে অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে "পিছিয়ে পড়া" হিসেবে চিহ্নিত করত।

নারীবাদী দ্বৈতনীতি: পশ্চিমা নারীবাদ আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে শরীরের অধিকতর প্রকাশকে স্বাধীনতা মনে করা হয়, অথচ নিজেকে ঢেকে রাখাকে 'গেঁয়ো' বা 'দমনমূলক' ভাবা হয়—যা একধরনের সাংস্কৃতিক পক্ষপাত।

হিজাবকে বাধ্যতামূলক না করে যারা এটিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে নেন, তারা পশ্চিমা নারীবাদী কাঠামোর বাইরে নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। তারা বলেন, হিজাব একজন নারীর নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ—নয় যে সেটা সমাজ ভোগ করবে, বরং তিনিই নির্ধারণ করবেন কাকে কী দেখাবেন।

৩. ব্যক্তিগত পছন্দ ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

প্রতিটি নারীর হিজাব পরিধানের অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়। অনেক নারী নিজ সংস্কৃতির কারণে ছোটবেলা থেকেই হিজাব পরেন, আবার অনেকেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে হিজাব গ্রহণ করেন নিজের বিশ্বাস ও উপলব্ধি থেকে।

এখানে দুটো বিষয় স্পষ্ট:

ব্যক্তিগত পছন্দ: ইসলাম হিজাবকে একটি ফরজ বিধান হিসেবে নির্ধারণ করলেও, বাস্তবিক প্রয়োগে একে ধাপে ধাপে গ্রহণের সুযোগ রাখে। অনেক মুসলিম নারী একসময় না পরলেও, পরবর্তীতে তা গ্রহণ করেন। তাই তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা: মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ বা আফ্রিকার মুসলিম নারীদের হিজাবের ধরনে ভিন্নতা দেখা যায়। এটি প্রমাণ করে যে হিজাব কেবল ধর্মীয় নয়, বরং

সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাও গ্রহণ করে। তবে মূল আদর্শ হচ্ছে, পর্দা এমন হতে হবে যাতে শরীরের সৌন্দর্য গোপন থাকে এবং তা সমাজে শালীনতা বজায় রাখে।

হিজাব ও পর্দা ইসলামি বিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। সমসাময়িক বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও, এটি মুসলিম নারীর আত্মপরিচয়, শালীনতা, এবং ধর্মীয় দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমা সমালোচনার মূল অংশগুলো ইসলামের সার্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। হিজাব কখনোই নারীর পরাধীনতার প্রতীক নয় বরং তা হতে পারে তার আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিচ্ছবি।

৭.৩: নারী নেতৃত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয় হল নেতৃত্ব বা **ইমামাহ** তথা নেতৃত্ব প্রদান এবং তা গ্রহণে নারীর ভূমিকা। নেতৃত্বের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় – রাষ্ট্রীয়, বিচারিক ও ধর্মীয় – ভিন্ন ভিন্ন ফিকহি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এখানে আমরা প্রত্যেকটি অংশের বিস্তারিত আলোচনা করবো প্রাসঙ্গিক হাদীস, কুরআনের নির্দেশনা, চার মাযহাবের অবস্থান এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গসহ।

১. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে নারী (القيادة السياسية للمرأة)

ক. প্রাসঙ্গিক হাদীস:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الجمل، بَعْدَ أَنْ كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجمل، فَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً."

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৪২৫)

খ. হাদীসটির বিশ্লেষণ:

- এই হাদীসের সাধারণ অর্থ হলো: "কোনো জাতি সফল হবে না যারা তাদের নেতৃত্ব নারীর হাতে তুলে দেয়।"

গ. চার মাযহাবের অবস্থান:

- **হানাফি:** নারী খিলাফত বা আমীরুল মুমিনীন পদে আসতে পারবেন না। তবে নিম্নস্তরের প্রশাসনিক কাজ বা সীমিত দায়িত্বে থাকা যেতে পারে (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ার্দী)।

- **মালিকি, শাফি, হাম্বলি:** অধিকাংশই উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ অগ্রহণযোগ্য মনে করেন।

- তবে, **আধুনিক স্কলারগণ**, যেমন ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, বলেন: নির্বাচিত গণতান্ত্রিক কাঠামোয়, যোগ্যতা থাকলে নারী রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আসতে পারেন।

২. বিচার ব্যবস্থায় নারী (المرأة في القضاء)

ক. কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

(সূরা সাদ, ৩৮:২৬)

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি; সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে বিচার কর।" আয়াতটিতে ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

খ. চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি:

- **হানাফি মাযহাব:** নারী বিচারক হতে পারেন *ফিকহি বিধানসমূহে*, তবে *হুদুদ ও কিসাস* (শাস্তিমূলক দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত বিষয়ে না।তবে নারীদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কেননা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন দায়িত্ব

- **মালিকি ও শাফি:** নারী বিচারকত্ব সমর্থন করেন না।

- **ইবনে জরীর তাবারি (মুফাসসির ও ফকীহ):** নারী যদি ফিকহে পারদর্শী হন, তবে বিচারক হওয়ায় কোনো আপত্তি নেই।

গ. সমসাময়িক অবস্থান:

- অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যেমন পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মিশর – নারী বিচারক নিয়োগ দিচ্ছে। কিন্তু এতে নারীদের যে পরিপূর্ণ পর্দা,নিরাপত্তা ,আলাদা কর্মস্থল দেয়ার দাবি ইসলামিক স্কলারগণ করে আসছেন তা পরিপূর্ণ ভাবে দেয়া হচ্ছে না

- শর্ত: যোগ্যতা, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও বিচারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. ধর্মীয় নেতৃত্বে নারী (القيادة الدينية للمرأة)

ক. ইমামতি ও খুতবা:

- নারীরা **নারীদেরকে জামাতে সালাত পড়াতে পারেন না** ।
  ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফির মতে: নারীরা নারীদের ইমাম হতে পারেন না ।
  (আল-মাবসূত, সারাখসি; আল-মুদাওয়ানা, মালিকি)
- তবে, নারীর দ্বারা **পুরুষদের ইমামতি করা নিষিদ্ধ**; এটি ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

খ. ধর্মীয় শিক্ষাদান:

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন প্রধান ধর্মীয় স্কলার, যিনি সাহাবীদেরও শিক্ষা দিতেন।

- ইসলামি শিক্ষায় নারীর ভূমিকা আছে: দারস, তালিম, তাফসির ক্লাস, মাদ্রাসা ইত্যাদি।

গ. মসজিদে বক্তব্য/খুতবা:

- **আধুনিক স্কলাররা** বলেন, যদি শালীনতা ও পর্দা বজায় থাকে, তবে শুধুমাত্র নারীদের উদ্দেশে নারী ধর্মীয় বক্তব্য দিতে পারেন – তবে খুতবা (জুমা) দেওয়া ইসলামি ঐতিহ্য ও ইজমার আলোকে নিষিদ্ধ।

ইসলামে নেতৃত্ব **যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে** নির্ধারিত হয়।ইসলামে নেতৃত্ব দায়িত্ব ও আমানত; এটি নারীর ক্ষমতায়নের কোন মাধ্যম নয় বরং ধর্মীয়,সামাজিক ও কৌশলগত কারণে পুরুষরাই নেতৃত্বের আসল হকদার ।

নবী ﷺ কর্তৃক নারীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে: যুদ্ধকালীন চিকিৎসা, সমাজসেবা, জ্ঞান বিতরণ ইত্যাদি।

- প্রাসঙ্গিক হাদীস ও ফিকহি ব্যাখ্যা অনুসারে বলা যায়: **রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয়, সামাজিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ অগ্রহণযোগ্য , কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নারী বিচারিক নেতৃত্বে স্থান পেতে পারেন যোগ্যতার ভিত্তিতে**।

৭.৪ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

(ক) ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়; বরং শর্তসাপেক্ষে বিশেষত তার জরুরতের উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত। নারীও পুরুষের মতোই একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং আল্লাহ তাঁর ওপরও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কর্মজীবনে নারীর অংশগ্রহণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হয়েছে।

- **কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি:**

وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ

"নারীদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জন অনুযায়ী অংশ।" — (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)
এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীর উপার্জনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থাৎ, নারী বৈধভাবে আয় করলে তা তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়, এবং এতে স্বামীর বা পরিবারের অন্য সদস্যের হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।

- **হাদীসের প্রেক্ষাপট:**

এক সাহাবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এসে প্রশ্ন করেন: "আমি এক মহিলা, হাতের কাজ করি এবং তার মাধ্যমে কিছু উপার্জন করি। আমার উপার্জনের মাধ্যমে আমার স্বামী ও সন্তানদের সাহায্য করি। এতে কি আমার জন্য সাওয়াব আছে?"
রাসূল (সা.) বললেন: "হ্যাঁ, এতে তোমার জন্য সাওয়াব আছে।" — (মুসনাদ আহমাদ: হাদীস ২৫৪৯৫)

- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:**

খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। রাসূল (সা.) তাঁর কর্মদক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নারীর স্বাধীনতা ও সম্মানজনক অংশগ্রহণের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

(খ) সামাজিক বাধা ও চ্যালেঞ্জ:

তবে বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, সমাজে নারীর কর্মজীবনে অংশগ্রহণ অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়:

1. **সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি:** নারীর প্রকৃত কাজ 'ঘর সামলানো', বাহিরে কাজ করা 'পরিবার এবং সন্তানের সুস্থ প্রতিপালনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য কথা ।

   কিন্তু জরুরতের কারণে একান্তই যদি পর্দা রক্ষা করে কোন নারী বাহিরে কাজ করতে পারে তবে সেই সুযোগ ইসলাম নারীদের দিয়েছে । কিন্তু সেকুলার তথা পশ্চিমাদের আদর্শে দীক্ষিত শ্রেণী মনে করে নারী তার ঘর থেকে বের হয়ে কাজ না করলে তার শিক্ষা,মেধা কোনটারই দাম নেই

2. **ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা:** অনেকক্ষেত্রে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে নারীর কর্মসংস্থানকে বাধা দেওয়া হয়, অথচ প্রকৃত ইসলাম এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে না।

3. **যাতায়াত ও নিরাপত্তার সমস্যা:** গণপরিবহন ও কর্মস্থলে হয়রানি, নিরাপত্তাহীনতা নারীদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

4. **পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা:** কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা নারীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন পরিবারের সহযোগিতা অনুপস্থিত থাকে।

5. **পেশাগত বৈষম্য:** কর্মক্ষেত্রে সমান পারিশ্রমিক, পদোন্নতি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদিতে বৈষম্য নারীদের নিরুৎসাহিত করে।

(গ) সমাধানের উপায়:

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এবং সমসাময়িক বাস্তবতা বিবেচনায় কিছু কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করা যায়:

1. **,চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করা:** যেখানে নারীরা সহজে সম্মানজনকভাবে কাজ করতে পারেন এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেন।

2. **শালীন পোশাক ও পর্দা রক্ষা করে কাজের সুযোগ তৈরি:** ইসলাম নারীকে পর্দা অবলম্বনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যেতে বাধা দেয়নি; বরং আলাদা কর্মক্ষেত্র , শালীনতার শর্তে অনুমতি দিয়েছে।

3. **নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা:** নারীদের জন্য নির্দিষ্ট যানবাহন ও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

4. **শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র (Day Care):** মায়েদের কাজের সুবিধার্থে শিশুদের দেখভালের জন্য প্রতিষ্ঠানে Day Care ব্যবস্থা রাখা উচিত।

5. **আইনি সহায়তা ও সুরক্ষা:** কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং নারীবান্ধব পরিবেশ , নীতি গ্রহণ করা উচিত।

6. **ইসলামী শিক্ষার প্রচার:** নারীর অধিকার নিয়ে ইসলামের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রচার করে সমাজে ভুল ধারণা দূর করতে হবে।

ইসলাম নারীকে শালীনতা, নিরাপত্তা ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করে কর্মজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। আজকের সমাজে নারীর সম্মানজনক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামের মূলনীতি বোঝাতে হবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে যৌথভাবে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৭.৫: নারী নির্যাতন ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ

নারী নির্যাতন একটি বৈশ্বিক সামাজিক সমস্যা, যা পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। ইসলামী শরিয়ত এমন এক জীবনব্যবস্থা যা নারীর প্রতি সহিংসতা, অবমাননা বা যেকোনো প্রকার জুলুমের কঠোর বিরোধিতা করে। বর্তমান সময়ে কিছু হাদীস ও ইসলামী বিধানকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে নারী নির্যাতনের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, যা ইসলামের প্রকৃত আদর্শের পরিপন্থী। এই অধ্যায়ে হাদীসের আলোকে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা, নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা এবং সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধনমূলক বিশ্লেষণ করা হবে।

১. পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা:

ক. ভুলভাবে ব্যবহৃত হাদীস:

একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে:

الرجال قوامون على النساء

"পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল।" (সূরা নিসা: ৩৪)

এই আয়াতকে কখনো কখনো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে নারীর প্রতি কর্তৃত্বপ্রবণতা এবং শারীরিক শাস্তি বৈধতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অথচ পরিপ্রেক্ষিতসহ পড়লে স্পষ্ট হয়, 'কওয়াম' এর অর্থ দায়িত্বশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্নেহময় নেতৃত্ব, অত্যাচারের অনুমোদন নয়।

খ. সংশ্লিষ্ট হাদীস:

রাসূল (সা.) বলেছেন:

"لا يضرب خياركم نساءهم"

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকেরা কখনোই তাদের স্ত্রীদের প্রহার করে না।" — (আবু দাউদ, হাদিস: ২১৪৬)

এ হাদীস স্পষ্টভাবে দেখায় যে প্রহার করা নবীজির দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। ইসলামী ফিকহে 'প্রহারের অনুমোদন' সংক্রান্ত আয়াত (সূরা নিসা: ৩৪) এর তাফসিরে উল্লেখ করা হয়েছে যে

তা সর্বশেষ বিকল্প, অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষতি সাধনবিহীন হতে হবে, এবং বাস্তবে তা নিরুৎসাহিতই করা হয়েছে।

গ. আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা:

"ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما"

"রাসূল (সা.) কোনো স্ত্রী কিংবা দাসকে কখনোই হাতে আঘাত করেননি।"— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৩২৮)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) নিজে বাস্তবে স্ত্রীদের কখনো প্রহার করেননি, বরং সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন।

২. নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামিক শিক্ষা:

ক. নৈতিকতা ও তাকওয়ার শিক্ষা:

ইসলামে নারীকে সম্মানের সাথে বিবেচনা করতে তাকওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:

"فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"

"নারীদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে থাকো।" — (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৮)

তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রই একজন মুসলিম পুরুষকে স্ত্রীকে ভালোবাসা ও সম্মান করার শিক্ষা দেয়।

খ. পারিবারিক দায়িত্ব ও করুণা:

"وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"

"তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" — (সূরা রূম: ২১)

ইসলামী দৃষ্টিতে দাম্পত্য সম্পর্ক ভালোবাসা ও দয়ার ভিত্তিতে গঠিত হওয়া আবশ্যক। নির্যাতন এই মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

গ. বিচার ও শাস্তির বিধান:

ইসলামী রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্ত্রী নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শারীরিক ক্ষতি বা মানসিক আঘাতকে ইসলাম 'জুলুম' হিসেবে চিহ্নিত করে।

"إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ"

"নিশ্চয়ই জালিমরা সফল হবে না।" — (সূরা আল-আন'আম: ২১)

৩. সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তবতা:

ক. ভুল ধারণা: ইসলাম স্ত্রী প্রহার বৈধ করেছে।

✔ **বাস্তবতা:**

তাফসির ও হাদীস অনুযায়ী প্রহার সর্বশেষ বিকল্প, কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত এবং রাসূল (সা.) নিজে তা কখনো ব্যবহার করেননি। এর মূল উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা।

খ. ভুল ধারণা: নারীরা পুরুষদের গোলাম ।

✔ **বাস্তবতা:**

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ পাক পুরুষদের নারীদের অলি বা অভিভাবকের মর্যাদা দিয়েছেন যাতে তারা সমাজ সংসারের কঠিন দায়িত্ব পালন করে নারীদের উপর চাপিয়ে না দেয় । এক্ষেত্রে উভয় একে ওপরের পরিপূরক প্রতিপক্ষ নয় ।

গ. ভুল ধারণা: ধর্মীয় অনুশাসন মানেই নারীকে নিয়ন্ত্রণ।

✔ **বাস্তবতা:**

ধর্মীয় অনুশাসন মানে নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ। ইসলাম নারীকে ব্যক্তিত্ব ও অধিকার দিয়েছে—শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার ও মত প্রকাশে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। রাসূল (সা.)-এর জীবন, কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে ইসলাম স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আদর্শ দিয়েছে। সমাজে প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। গবেষক, আলিম ও সমাজবিদদের দায়িত্ব হলো এই ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করা এবং ইসলামের প্রকৃত মানবিকতা তুলে ধরা।

অধ্যায় ৮. প্রস্তাবিত নারী সংস্কার কমিশন' ও এর স্বরূপ

৮.১ -পারিবারিক ,সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে

একটি সমাজের ভিত্তিই গঠিত হয় তার ধর্ম, সংস্কৃতি ও পারিবারিক মূল্যবোধের উপর। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবিত 'নারী সংস্কার কমিশন' যেভাবে তথাকথিত অধিকার ও সমতা চর্চার নামে একের পর এক ধর্ম ও সমাজবিরোধী প্রস্তাব তুলে ধরেছে, তা শুধুমাত্র বিভ্রান্তি তৈরি করাই নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত সমাজ ভাঙার নীলনকশা ও।

এই পর্বে আমি তিনটি মূল সুপারিশের গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরব, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের পারিবারিক কাঠামো, ধর্মীয় ভারসাম্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতা চরম হুমকির মুখে পড়বে।

—

১. উত্তরাধিকার সম্পত্তির সমান ভাগ: ন্যায়বিচার না, বরং একচোখা অধিকার চর্চা

- শুধুমাত্র ‘সমান ভাগ’ শব্দটি উচ্চারণ করলেই কি নারীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত হয়? উত্তর হলো 'না' সমান ভাগ কিংবা সমতাই নারীর প্রতি সুবিচার নিয়ে আসতে পারে না। তাই উত্তরাধিকার সম্পত্তির সমান ভাগকে মূলত অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা ছাড়া সমান

ভাগের দাবির এক বাহ্যিক রূপকেই তুলে ধরছে। যা মূলত নতুন ধরনের অবিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

- ইসলামী শরীয়তে নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি নির্ধারিত হয়েছে বাস্তব দায়িত্ব বিবেচনা করে। পুরুষের উপর রয়েছে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব। স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা — সবাইয়ের ভরণপোষণ তার ঘাড়েই। অপরদিকে নারী পিতার, স্বামীর কিংবা ভাইয়ের সহায়তায় জীবনযাপন করে এবং সেই নারীর প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর কোনো আর্থিক দায়িত্ব চাপানো হয় না। আবারো বলছি নারীর প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর কোনো আর্থিক দ্বায়িত্ব চাপানো হয় না। কিন্তু একজন পুরুষ বাবা হিসেবে তার সম্পত্তি কন্যা এবং পুত্রকে, স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে দিতে বাধ্য। এমনকি মা বেঁচে থাকলে তিনিও এই সম্পত্তির ভাগ পাবেন। তাহলে একজন নারীকে সেই জায়গায় কল্পনা করুন তো। যিনি মূলত একাধারে স্ত্রী, কন্যা এবং মা!
- তাহলে এখন প্রশ্ন, বাস্তব জীবনে যেসব দায়িত্ব পুরুষের, সেসব কি তবে এখন নারী ভাগ করে নিচ্ছে? বাস্তবতা হলো 'না' নিচ্ছে না। বরং তারা শুধু সম্পত্তির ভাগ চাইছে।তাই কেবল সম্পত্তির ভাগ দাবি করা কোনো ন্যায়বিচার হতে পারে না। বরং এটি দায়িত্বহীন অধিকার প্রথার এক সূচনা।
- অধিকার ও দায়িত্ব যদি সমান্তরালে না চলে, তাহলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই ধরনের আইন বাস্তবায়ন মানে শুধুই ইসলাম বিদ্বেষ নয়, বরং পুরুষদের প্রতি নির্মম অবিচার হবে।

২. যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি: পতিতাবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি-

- এই সুপারিশটি আসলে একটি লজ্জাজনক সামাজিক অধঃপতনের সূচনা। সমাজ যেসব কাজকে নৈতিকভাবে নিন্দা করে, ধর্ম যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্র যাকে এখনো সীমিতভাবে মেনে নেয়—তাকে "পেশা"র মর্যাদা দেওয়া মানে আমাদের কিশোর-তরুণ প্রজন্মের সামনে একটি অপশন খুলে দেওয়া, যেখানে শ্রম আর সততা নয়, শরীরই জীবিকা অর্জনের বৈধ উপায়!
- এই সিদ্ধান্ত কেবল সমাজের নৈতিক কাঠামো নয়, নারীর মর্যাদাকেও অপমানিত করে। কেউ যদি দারিদ্র্যের কারণে পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়, তাহলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার জন্য বিকল্প নিরাপদ পেশার ব্যবস্থা করা—not to legalize her exploitation.
- বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই আইন আসলে যৌনপেশাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধ করলে একদিকে সমাজে বিকৃত চাহিদা স্বাভাবিক করে তুলবে, অন্যদিকে নারীদের মর্যাদাকে নামিয়ে আনবে শুধুই ভোগ্যপণ্যের পর্যায়ে।এভাবে 'সংস্কার' হয় না, 'সঙ্কার' তৈরি হয়।

৩. বৈবাহিক ধর্ষণ আইন: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে পুলিশের হস্তক্ষেপ-

- বৈবাহিক ধর্ষণ আইন চালু করা মানে একটি পবিত্র ও পারস্পরিক বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্কে সন্দেহের দেয়াল তুলে দেওয়া। ইসলাম ও আমাদের সাংস্কৃতিক রীতিতে বিবাহ মানে শুধু কাগজের চুক্তি নয়, একে অপরের প্রতি দায়িত্ব, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ত্যাগের সম্পর্ক।
- কিন্তু বৈবাহিক ধর্ষণ নামক আইনের প্রবর্তন হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটে যাওয়া যে কোনো মানসিক দুর্বলতা বা ঝগড়াকেও ফৌজদারি মামলায় রূপ দেওয়া সম্ভব হবে। যা একদিকে পরিবারের ভিত নষ্ট করবে, অপরদিকে স্বামীদের মনে তৈরি করবে চরম নিরাপত্তাহীনতা।
- বিবাহিত জীবন কখনোই পারফেক্ট হয় না, তাতে সময়ে সময়ে বিরোধ, মান-অভিমান, রাগ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু এসবকে 'ধর্ষণ' বলে আখ্যায়িত করা মানে একধরনের ভয়াবহ সামাজিক বিভাজন তৈরি করা।

উপসংহার: সুরক্ষা না, বরং নারীর দায়িত্বহীন স্বাধীনতার রঙিন মোড়কে পরিবারবিরোধী নীলনকশাই এই 'নারী অধিকার সংস্কার' কমিশন।

- এই কমিশনের পুরো সুপারিশপত্রে কোথাও 'নারী মানে একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন মেয়ে'—এই পরিচয়গুলোর মর্যাদা রক্ষা বা বাস্তব সমস্যার (যেমন: নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা) সমাধান নেই।
- বরং **এখানে নারীর পরিচয়কে কেবল একজন "independent ভোক্তা ও ভোগ্য" নাগরিক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।**
- এটা কোনো সমতা নয়, এটা নতুন রকমের বিভ্রান্তিকর নারীবাদ, যা পরিবারকে ভাঙে, ধর্মকে আঘাত করে, সমাজে নৈতিকতার অবসান ঘটায়। তাই আমি, একজন মুসলিম নারী হয়ে দৃঢ়ভাবে বলছি - এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন মানে নারীকে নয়, সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিবে।

৮.২-ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

প্রথম পর্বে আমরা যে সুপারিশগুলোর উপস্থাপন দেখেছি—উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান ভাগ, পতিতাবৃত্তিকে স্বীকৃতি ও বৈবাহিক ধর্ষণ আইন— এসবকে যখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই সংস্কারচেষ্টা আসলে ইসলামের সার্বিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এই পর্বে আমরা সেটা নিয়েই আলোচনা করবো।

ইসলামে নারীর অবস্থান: নিপীড়ন নয়, পূর্ণ মর্যাদার আশ্রয়

ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছে, তা কেবল প্রথাগত পশ্চিমা নারীবাদ দিয়েই বোঝা সম্ভব নয়। ইসলাম যেখানে বলে-"পুরুষরা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"(সূরা নিসা, আয়াত ৩৪)এই শ্রেষ্ঠত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়, বরং দায়িত্ব।

পুরুষ উপার্জন করবে, নারীকে ভরণপোষণ দেবে, আর নারী তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে সমাজে চলবে। এখানেই ভারসাম্য। এটি নিছক সামাজিক ভূমিকা নয় — একটি ধর্মীয় নির্দেশ, যার মাধ্যমে নারীকে শোষণের নয়, রক্ষার অবস্থানে রাখা হয়েছে।

১. উত্তরাধিকার: সমান নয়, ন্যায্য বণ্টন

- ইসলামই প্রথম ধর্ম যা নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে — তাও সেই সময় যখন সমাজে নারীর অস্তিত্বই গৌণ ছিল। কিন্তু ইসলাম সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ‘সমতা’র ধারণা দেয়নি,দিয়েছে ‘ন্যায়’-এর ভিত্তি।
- একজন ভাই দ্বিগুণ পায় কারণ তাকে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নিতে হয়। বোন পান এক ভাগ কারণ তার খরচ বহন করে পুরুষরা।
- এই কাঠামোতে নারী তার অর্থ সম্পূর্ণ নিজের জন্য রাখতে পারে। তাকে সংসার চালাতে হয় না, তার উপার্জনে পরিবার চলে না—বরং পুরুষের উপার্জনেজ চলে তার ভরণপোষণ।“পুরুষের যা অর্জন, তা তার জন্য; এবং নারীর যা অর্জন, তা তার জন্য।”(সূরা নিসা, আয়াত ৩২)
- অতএব, এই বণ্টন কখনোই নারীকে বঞ্চিত করে না তাকে 'অর্থনৈতিক দায়িত্বমুক্ত মর্যাদা' দিয়েছে। সুতরাং বলা যায় নারীকে খরচ না করার স্বাধীনতা দিয়ে ইসলাম তাকে উলটো বাড়তি সুবিধায় রেখেছে। এটা কোনোভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য হতে পারে না , বরং এটা নারীর জন্য উচ্চতর সুরক্ষা।

২. পতিতাবৃত্তি: স্বাধীনতা নয়, নারীর শোষণের সর্বনিম্ন স্তর

- ইসলামে নারীর যৌনতা তার মর্যাদা ও নিরাপত্তার অংশ। এই মর্যাদা হলো তার ইজ্জতের রক্ষা, তার পরিচয়ের পবিত্রতা।
- ইসলাম নারীকে ‘বিক্রয়যোগ্য বস্তু’ নয়, বরং ‘রহমতের বাহক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।"তোমরা তোমাদের দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না, যদি তারা পবিত্র থাকতে চায়..."(সূরা নূর, আয়াত ৩৩)
- যে সমাজ নারীকে শুধু দেহের মাধ্যমে উপার্জন করতে শেখায়, সেখানে নারী আসলে পণ্য হয়ে যায়। পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া মানে নারীর শরীরকে বৈধ

কর্পোরেট ব্যবসার ‘পণ্য’ বানানো। যেখানে স্বাধীনতার নামে তাকে পরিণত করা হয় মনুষ্যত্বহীন এক শরীরে।

- এটা নারীর জন্য সম্মান নয় বরং স্পষ্টতই এটা শোষণের সবচেয়ে নিচু স্তর।

৩. বৈবাহিক ধর্ষণ: সম্পর্ক না বোঝা 'আইন', পরিবার ধ্বংসের ফাঁদ

- বিবাহ ইসলামে কেবল একটি চুক্তিই নয়। এটি হল দুটি হৃদয়ের বন্ধন, দুটি দায়িত্বের ভারসাম্য।“তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য আচ্ছাদন, আর তোমরা তাদের জন্য আচ্ছাদন।”(সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)
- ইসলাম নারীকে কেবল যৌন স্বাধীনতা দেয়নি — দিয়েছে সম্মতি ও অস্বীকৃতির অধিকার, দিয়েছে বিচ্ছেদের সুযোগ, দিয়েছে পারিবারিক সালিশের ব্যবস্থা।
- বৈবাহিক জীবনের জটিলতা, মানসিক দুর্বলতা কিংবা অস্থায়ী দাম্পত্য সংকটকে “ধর্ষণ” বলে আইনগত লেবেল দিলে সেখানে আর সম্পর্ক থাকে না, এটি তখন হয়ে যায় শত্রুতা।এটি মূলত পরিবার ধ্বংসের পথ। এটি ধর্মীয় কাঠামোকে নস্যাৎ করার সূক্ষ্ম ফাঁদ।
- ইসলামে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একটি “দ্বিপাক্ষিক দায়িত্ব ও সংবেদনশীলতা”র নাম, যেখানে উভয়ের প্রয়োজন ও সীমা বিবেচিত হয়। এখানে আইন নয়, হৃদয় কাজ করে।

শেষকথা:

'নারী সংস্কার কমিশনের' নাম শুনে হয়তো মনে হতে পারে এটি নারী-সহায়ক কোনো আশার বার্তা। কিন্তু বাস্তবে এর প্রস্তাবনার মধ্যে আছে:

- • ইসলামের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা তৈরি
- • পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করে নারীদের একাকীত্বের পথে ঠেলে দেওয়া
- • পুরুষদের দায়িত্বহীন করে নারীদের এক অসহনীয় প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া
- ইসলাম নারীকে প্রতিযোগী নয়, সহযাত্রী বানায়। নারীকে পুরুষের বিরোধিতা শেখায় না বরং আলাদা পরিচয় ও মর্যাদার ভিত তৈরি করে দেয়।
- নারীর স্বাধীনতার কথা উঠলেই ধর্মকে ফেলে দিতে হয় কেনো? ইসলাম তো বরং নিজেই নারীকে কেবল অধিকারের বেশি দিয়েছে একটা পরিচয়। দিয়েছে নিরাপত্তার ও আশ্রয়।

অধ্যায় ৯: নারীর অধিকার নিয়ে ভুল ধারণা ও বাস্তবতা

৯.১ প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ

(ক) বিবাহ সম্পর্কিত ভুল ধারণা

ভুল ধারণা:

অনেকে মনে করে, ইসলামে নারীদের ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই; তাদের বিবাহ সম্পূর্ণরূপে পুরুষ অভিভাবকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, নারীকে জোর করে বিবাহ দেওয়া যায়।

বাস্তবতা:

- ইসলামে নারীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا "হে ঈমানদারগণ! নারীদের জোর করে উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।" — *(সূরা আন-নিসা, ৪:১৯)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
- "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن" "বিধবা নারীকে তার আদেশ (সম্মতি) না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না।"— *(সহীহ বুখারী: ৫১৩৬, সহীহ মুসলিম: ১৪১৯)*
- ইমাম নববী (রহ.) বলেন, "এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, নারীর সম্মতি বিবাহের জন্য আবশ্যক, তাকে উপেক্ষা করে বিবাহ বৈধ নয়।"
- ইসলামে নারীর ইচ্ছা বিবাহে প্রধান ভিত্তি। তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ শরয়ীভাবে অবৈধ ও বাতিলযোগ্য।

(খ) উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ভুল ধারণা

ভুল ধারণা:

অনেকে মনে করেন, ইসলাম নারীকে সম্পদে পুরুষের চেয়ে অর্ধেক দেয়, এটি নারী বিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ।

বাস্তবতা:

- ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল আর্থিক দায়িত্বের ভারসাম্য। পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণ, স্ত্রী-মাহর, সন্তান-আবাবার খরচ বহন করতে হয়। নারী নিজের সম্পদ নিজের ইচ্ছামতো রাখতে ও ব্যয় করতে পারেন।
- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "পুরুষের জন্য দুই নারীর সমান অংশ।" — *(সূরা আন-নিসা, ৪:১১)*

- "এটি ন্যায্যতার পরিপূর্ণ প্রতিফলন, কারণ পুরুষের উপর নারীর তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত।" তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে (খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৯) বলা হয়েছে

- ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার হরণ করেনি, বরং আর্থিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে যথাযথ ও ন্যায্য অংশ প্রদান করেছে।

(গ) সাক্ষ্য সম্পর্কিত ভুল ধারণা

ভুল ধারণা:

অনেকে বলেন, ইসলাম নারীর সাক্ষ্যকে অর্ধেক মনে করে, যা তাদের মানসিক বা জ্ঞানের অক্ষমতা নির্দেশ করে।

বাস্তবতা:

- এই ধারণাটি আংশিক ও প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন। কুরআনে বলা হয়েছে:
- فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ... "যদি দুইজন পুরুষ না পাও, তবে একজন পুরুষ এবং দুইজন নারী হোক..." — *(সূরা আল-বাকারা, ২:২৮২)*
- এই নির্দেশনা শুধুমাত্র আর্থিক ও দেনা-পাওনার লেনদেন সম্পর্কিত লিখিত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে। ফৌজদারি, পারিবারিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষ্যই অগ্রহণযোগ্য হয়।
- এখানে নারীর কম মর্যাদা নয়, বরং স্মৃতির পার্থক্য ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীর (২:২৮২)
- নারীর সাক্ষ্য সর্বক্ষেত্রে অর্ধেক নয়; বরং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত হয়েছে। এটি নারীকে অবমূল্যায়ন নয়, বরং ন্যায়সংগত বাস্তবতা।

(ঘ) হিজাব ও পর্দা সম্পর্কিত ভুল ধারণা

ভুল ধারণা:

অনেকে মনে করে ইসলাম নারীদেরকে পর্দার নামে বন্দি করে রাখে, তাদের ব্যক্তিত্বকে দমন করে এবং কর্মক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করে।

বাস্তবতা:

- ইসলামে পর্দা নারীর মর্যাদা রক্ষার এক উত্তম ব্যবস্থা, যা সমাজে শালীনতা বজায় রাখে। আল্লাহ বলেন:
- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِن "হে নবী! আপনার স্ত্রীদের এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের ওড়নাগুলো দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে রাখে।"— *(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)*

- হিজাবের উদ্দেশ্য হল নারীর সম্মান রক্ষা ও অশ্লীলতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা। এটি কোনোভাবেই নারীর উন্নয়ন বা কর্মসংস্থান প্রতিহত করে না।
- “হিজাব বাধা নয়, বরং নারীর ব্যক্তিত্ব রক্ষার উপায়।” তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন (খণ্ড ৭, পৃ. ১৮৭)
- ইসলামের পর্দা নারীকে ঘরে আবদ্ধ করে না বরং তাকে সম্মান, নিরাপত্তা ও পরিচয় রক্ষার একটি নিরাপদ কাঠামো প্রদান করে।

উল্লিখিত চারটি ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে গড়ে ওঠা বহু প্রচলিত ভুল ধারণা সমাজে নারীর সঠিক মর্যাদা ও অধিকার বোঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করছে। ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস—কুরআন ও সহীহ হাদীস—স্পষ্টভাবে নারীর সম্মান, সম্মতি, সম্পত্তির অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কাজেই এই ভুল ধারণা দূর করে বাস্তব ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে সমাজে নারীর প্রতি ন্যায় ও মর্যাদার আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯..২: ভুল ধারণার উৎস ও কারণ

❖ **ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব**

- ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, নারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদেরকে পুরুষের ভোগ্যসম্পদ মনে করাই ছিল প্রথাগত।
- ইসলাম এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটালেও বহু সংস্কৃতিগত ধারণা সমাজে দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকায়, ইসলামি বিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ইসলামের আগমন ঘিরে জাহেলি সংস্কৃতির যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল, তার অনেকাংশ আজও রয়ে গেছে মুসলিম সমাজে। অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেদের আচার-আচরণ ও পারিবারিক প্রথাকে ইসলামি বিধান বলে মেনে নেয়, যদিও তা মূল ইসলামী শিক্ষার সাথে অসঙ্গত। এই সাংস্কৃতিক প্রভাব নারীর অধিকার সংক্রান্ত ইসলামী ব্যাখ্যাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

❖ **ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা**

- নারীর অধিকার বিষয়ক অনেক ইসলামী বিধান সঠিকভাবে অনুধাবন না করে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের “ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” (সূরা নিসা ৪:৩৪) আয়াতকে অনেক সময় নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদিও আসলার্থ হলো—পুরুষের উপর নারীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আরোপ।

- অনুরূপভাবে, সাক্ষ্যে নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার হুকুম (সূরা বাকারা ২:২৮২) প্রেক্ষিত বিচারে, আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; একে সাধারণ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা একটি ফিকহি ভুল ব্যাখ্যার ফল।
- এইসব অপব্যাখ্যা অনেক সময় সমাজে প্রচার পায় ইসলামবিরোধী চক্রের মাধ্যমে, যারা ইসলামকে নারীবিদ্বেষী ধর্মরূপে চিত্রিত করতে চায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বল্পশিক্ষিত ইমাম বা ওলামাগণ প্রেক্ষিত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ছাড়াই আয়াত বা হাদীস উদ্ধৃতি দিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রচার করেন।

❖ সামাজিক প্রথার প্রভাব

- অনেক মুসলিম সমাজে ইসলামি বিধানের চেয়ে সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীদের পর্দা, হিজাব পালনে অসহযোগিতা, পৃথক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বাধা দেওয়া, উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করা—এসব সমাজচর্চা প্রায়শই সামাজিক অনুশাসনের মোড়কে উপস্থাপিত হয়, যদিও ইসলাম এসব বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে।
- উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে নারীর জীবনযাপনের জন্য ধর্মীয় ফরজিয়াত শিক্ষা ফরজ হলেও, কিছু অঞ্চলে কন্যাশিশুর শিক্ষাকে অবহেলা করা হয় । আবার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত শরীয়তের নিয়ম অনুসারে নারী অবশ্যই অংশীদার, কিন্তু অনেক সমাজে তাকে ‘স্বেচ্ছায়’ ভাইদের জন্য উত্তরাধিকার ছেড়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এসব সামাজিক অনুশাসন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকায়, তা ইসলামের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে, ফলে ভুল ধারণা আরও শক্তিশালী হয়।

নারীর অধিকার বিষয়ে ইসলামে যে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে, তা বাস্তবে উপেক্ষিত হওয়ার পেছনে ঐতিহাসিক জড়তা, সাংস্কৃতিক প্রভাব, কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং সমাজের প্রচলিত প্রথার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ভুল ধারণাগুলি শুধুমাত্র নারী নয়, ইসলামের সার্বিক ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এজন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষার প্রসার, প্রাসঙ্গিক ফিকহি ব্যাখ্যার প্রচার এবং সংস্কারমূলক উদ্যোগ।

৯..৩ সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে সমাজে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তা অনেকাংশেই তথ্যের ঘাটতি, বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভুল উপস্থাপনার ফসল। এ সমস্যার প্রতিকার করতে হলে সঠিক তথ্য ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র—শিক্ষা ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব—মূল ভুমিকা পালন করতে পারে।

১. শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা

শিক্ষা হচ্ছে মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে ভুল ধারণা শুধরাতে হলে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ ও প্রামাণ্য ধর্মীয় জ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

- পাঠ্যসূচিতে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ফিকহ, তাফসির ও সিরাত গ্রন্থাবলি অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কীভাবে সংরক্ষিত, তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণে ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস যেমন কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর জোর দিয়ে, বর্তমান সময়ের সাথে সমন্বয় করে ধর্মীয় মূলনীতির ভিত্তিতে ও নারীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা উচিত।
- মাদ্রাসা ও আলিয়া/জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় করে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামি মূল্যবোধ ভিত্তিক পাঠ্য পরিবেশন আবশ্যক।

তদুপরি, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষালাভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেরাও ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলতে পারেন।

২. গণমাধ্যমের দায়িত্ব

গণমাধ্যম আধুনিক যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবশালী মাধ্যমগুলোর একটি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, ইসলামে নারীর অধিকার সংক্রান্ত অনেক ভুল ব্যাখ্যা ও নেতিবাচক প্রচারণা গণমাধ্যমেই বেশি বিস্তার লাভ করে।

- টেলিভিশন, সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামের নারীবান্ধব দিকগুলো তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ইসলামি স্কলারদের যুক্তিসম্মত আলোচনা, ইতিহাসভিত্তিক প্রামাণ্য দলিল ও বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- ভ্রান্ত প্রচারণা ও অপব্যাখ্যা নিরসনে 'ফ্যাক্ট-চেকিং' ও দায়িত্বশীল ধর্মীয় মতামত গ্রহণের চর্চা চালু করা উচিত।

এ ছাড়া, নারী সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে, তারা নিজেরাই নারী অধিকারের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. ধর্মীয় নেতাদের অবদান

ধর্মীয় নেতারা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চেতনা গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখেন। তাঁদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই তাঁদের উপর ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

- ইমাম, আলেম ও খতিবদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।
- জুমার খুৎবায় বা অন্যান্য ধর্মীয় আলোচনায় নারীর মর্যাদা, শিক্ষা, উত্তরাধিকার, বিবাহের অধিকার ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা উচিত।
- মধ্যযুগীয় কিছু ব্যাখ্যাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে প্রামাণ্য দলিলের আলোকে সমসাময়িক বাস্তবতা অনুযায়ী আলোচনার সাহস থাকতে হবে।

এছাড়া, নারীদেরকেও উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষাদানে সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ইসলামে নারীর অধিকার একটি পরিপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায্য ব্যবস্থাপনার অংশ। কিন্তু এই বার্তা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যার দরকার, তা তখনই সম্ভব যখন শিক্ষা ব্যবস্থা, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব একসঙ্গে সচেতন, দায়িত্বশীল ও আধুনিক চিন্তাধারায় কাজ করবে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুযায়ী নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এই তিন ক্ষেত্রের সমন্বিত ভূমিকা অপরিহার্য।

অধ্যায় ১০: উপসংহার

১০.১: সার-সংক্ষেপ

"ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার" বিষয়ক এই গবেষণাকর্মে ইসলামী শরীয়তের আলোকে নারীর নানামুখী অধিকার, সামাজিক মর্যাদা এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনের আলোচনা করা হয়েছে। এই থিসিসে পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস, চার মাযহাবের ফিকহগ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও দায়িত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১০.২: সামগ্রিক সিদ্ধান্ত

ইসলামে নারী শুধুমাত্র একজন জীবিত সত্তা নয়; বরং তিনি সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ ও দায়িত্ববান এক স্বতন্ত্র সত্তা। ইসলামের আগমনের পূর্বে নারী ছিল অবমাননার প্রতীক, অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বীকৃতি ও সম্মান। কুরআনের আয়াতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।" *(সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৩)*

ইসলাম নারীর জন্য দিয়েছে:

- **আত্মিক মর্যাদা:** নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, আমলের মূল্যায়নে সমতা।

- **পারিবারিক অধিকার:** নারী মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্মানিত। মা হিসেবে তার মর্যাদা এতটাই মহান যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো" — তিনবার।

- **অর্থনৈতিক অধিকার:** নারী সম্পত্তির মালিক হতে পারে, নিজের আয় নিজের উপর ব্যয় করতে পারে, উত্তরাধিকার পেতে পারে।

- **শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকার:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয।"

- **সামাজিক ভূমিকা:** সাহাবিয়া নারীগণ ইবাদত, যুদ্ধ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন শরঈ সীমা বজায় রেখে।

তবে, সময়ের পরিবর্তনে এবং কিছু সংস্কারবিরোধী সমাজে নারীর এই ইসলামী অধিকার বাস্তবায়নে দেখা গেছে সীমাবদ্ধতা। কখনও পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, কখনও পশ্চিমা নারীবাদী আন্দোলনের চাপে ইসলামী নারীতত্ত্ব বিকৃত হয়েছে।

আধুনিক কালের Feminism নারীর মুক্তির নামে অনেক সময় তাকে ধর্মহীন, পরিবারহীন ও নৈতিকতাবর্জিত এক জীবনে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজেও কিছু ক্ষেত্রে নারীর অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি—যেমন: উত্তরাধিকার বণ্টনে অনিয়ম, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা, কর্মস্থলে বৈষম্য ইত্যাদি।

তাই, ইসলামের মূল উৎসসমূহের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং প্রাসঙ্গিক ফিকহি ব্যাখ্যার আলোকে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তা না পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে ভেসে যায়, আর না কালচারের নামে ইসলামের আসল শিক্ষাকে চাপা পড়ে।

১০.৩: কার্যকরী সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

১. ইসলামী শিক্ষা বিস্তার: নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসায় পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২. নারীবান্ধব ফতোয়া বোর্ড: আলিমদের নিয়ে ফতোয়া বোর্ড গঠন করে সমসাময়িক প্রশ্নের শরঈ উত্তর দেয়া যেতে পারে।

৩. আইন-শরীয়ার সমন্বয়: পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে আইন সংস্কার আবশ্যক।

৪. নারীদের অংশগ্রহণে দাওয়াহ প্রসার: দাওয়াহ কার্যক্রমে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

৫. পারিবারিক সহিংসতা রোধে প্রচারণা: ইমাম, খতীব ও মিডিয়ার মাধ্যমে "নারীর প্রতি সহিংসতা হারাম" বিষয়ক প্রচার জোরদার করতে হবে।

৬. নারীর নিরাপদ কর্মপরিবেশ: শরীয়তের সীমারেখা বজায় রেখে নারীর জন্য নিরাপদ কর্মস্থল গড়ে তুলতে হবে।

৭. পর্দা ও শালীনতার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা: শরীয়তের মূলনীতি বজায় রেখে পর্দাকে বাধা নয়, বরং সম্ভ্রম হিসেবে সমাজে তুলে ধরা।

📌 পাদটীকা (Footnotes)

১. জাহিলিয়াত যুগে নারী শিশু অবস্থায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো; দেখুন: সূরা তাকভীর (৮১:৮-৯)।

২. রাসূল (সা.) এর হাদীস: "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" (তিরমিযী, হাদীস ৩৮৯৫)।

৩. নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত: সূরা আন-নিসা, ৪:৭।

🙵 সংযুক্ত পরিশিষ্ট (Appendix A)

তালিকা: ইসলামী ও পশ্চিমা নারীতত্ত্বের তুলনামূলক চিত্র

বিষয়ের নাম	ইসলামী নারীতত্ত্ব	পশ্চিমা নারীবাদ
আত্মমর্যাদা ও পরিচয়	সৃষ্টিকর্তার অধীনে সম্মানিত সত্তা	স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা
পরিবারে ভূমিকা	মা, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে উচ্চ সম্মান	ব্যক্তিস্বাধীনতা মুখ্য, পরিবার গৌণ
সম্পত্তির অধিকার	উত্তরাধিকার, দান, হেবা – শরীয়তে স্বীকৃত	সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানা
শিক্ষার অধিকার	জ্ঞানার্জন ফরয	ব্যক্তিগত পছন্দ
কর্মজীবন ও সীমাবদ্ধতা	শরঈ শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন	সীমাহীন স্বাধীনতা